ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কলিকাতা,
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

১৯১৪

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

ভূমিকা।

[শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

অন্যদেশে মৃত্যুর পর প্রিয়জনকে সমাহিত করিয়া তাহার অবশেষ যথাসাধ্য রক্ষার চেষ্টা করে ; ভারতবর্ষে প্রিয়জনকে চিতায় দগ্ধ করিয়া তাহার চিহ্নমাত্র রাখে না। তাহার জন্মকোষ্ঠী পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু ছিল না। অতীত ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সমুদায়ই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার জন্মকোষ্ঠী ও জীবনের কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে।

অন্যদেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এদেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এদেশ রাখিতে চাহে না। স্বদেশের অতীতকেই ভুলিয়া গিয়াছে ; বিদেশের ত কথাই নাই। বিদেশের কোন সংবাদই কখনও রাখিত কি না, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাহার প্রমাণ নাই।

ইউরোপের কাছে এই বিদ্যাটা আমাদের শিখিবার ছিল। চতুষ্পাঠীতে এই বিদ্যার জন্য কখনও কাহারও কৌতূহল ছিল না, এখনও নাই। ইংরেজের স্থাপিত স্কুল-কলেজে এই বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজের নিকট আর যাহা শিক্ষণীয় থাক না কেন, এই বিদ্যা শিখিবার ছিল।

অৰ্দ্ধশত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাসের গ্রন্থ অনেক মুখস্থ করিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাস-বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। কি স্বদেশ কি বিদেশ, কোন দেশের ইতিহাস জানিতে আমাদের শ্রদ্ধার কোন প্রমাণ পাই না। আমাদের ধাতে ইহা লাগে নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ঘরটা একবারে শূন্য। খানকতক পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। আজ-কাল স্বদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক দেখিতেছি। তাহাতে এখনও ফলের চেয়ে পল্লবের আধিক্য।

স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা দেখি না। সেই অতীতের কথা আলোচনা করিতে ভাবুকের চিত্ত স্তম্ভিত হয়, দার্শনিকের চিত্ত দিশাহারা হয়, যাঁহারা মানবের বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল, তাঁহারা গন্তব্য ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া হাবুডাবু খান।

এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটি উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি বিদেশের কাহিনী আলোচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশের কথারও যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছিলেন, বিদেশের নিকট যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্বদেশের আলোচনায় তাহা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়া গন্তব্য ও

কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে একটি বই ভূদেব জন্মিল না। হায় বাঙ্গালা দেশ!

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমান্ বিনয়কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। ইঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা আছে, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অনুরাগ আছে। এই তরুণ বয়সে ইঁহার উদ্যমের পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিতেছেন; সেই তুলনা-মূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার অর্জ্জনে উদ্যম করিতেছেন। সেই উদ্যমের ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তক।

পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটা আকাঙ্ক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পড়িয়া আমার আনন্দ হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন। ইতিহাসকে কেবলমাত্র ঘটনা-পঞ্জী মনে করিয়া যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা দুর্ভাগ্য। বহু সহস্রবৎসরের মানবজাতীর মর্ম্মকথা ইতিহাসমুখে প্রকাশ পায়; মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের হৃৎস্পন্দন ইতিহাস দ্বারা কর্ণগত হয়; সেই পুরুষের তপ্ত নিশ্বাস ইতিহাস-মুখে বহির্গত হয়। স্থির-যৌবন মানব তাহার শত শতাব্দের বার্দ্ধক্য অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ভূয়োদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার বলে গুরুগম্ভীর উপদেশবাণী প্রচারিত করে, তাহা ইতিহাসের মুখেই শুনিতে পাই। সকলে শুনিতে পায় না। শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বিনয়বাবুর স্পৃহা ও উদ্যম ও অধ্যবসায় আছে। সেই উপদেশ-বাণী শুনিবার জন্য যদি কোন পাঠকের মনে কিয়ৎপরিমাণেও সেই স্পৃহা ও উদ্যম ও অধ্যবসায় এই পুস্তিকাদ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রচার ব্যর্থ হইবে না।

ফাল্গুন, ১৩১৮ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সকলগুলিতেই একটি বিশেষ আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের রীতিতে ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই কয়টি সত্য আবিষ্কৃত হয়—

প্রথমতঃ, মানব কখনও কোন দেশেই সার্ব্বজনীন চরম সত্যের উপলব্ধি করে নাই। সকল যুগেই মানব-সমাজ কালোপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়া সাময়িক ও প্রাদেশিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, কোন জাতিই জগতে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করে নাই। জাতীয় চরিত্র ও ভাগ্য বিভিন্ন জাতির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতেই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও এক জাতির উন্নতি-অবনতিতে সমগ্র বিশ্বেরই ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, মানবের জীবনীশক্তি সর্ব্বত্র এবং সকল যুগে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেখা দেয় নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা প্রভৃতির সভ্যতার বিচিত্র অঙ্গে মানবজীবনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও এক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনই পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় এই কয়টি সত্যের প্রয়োগ আবশ্যক। তাহা না হইলে আমাদের দেশে ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্যকরী হইতে পারিবে না এবং আমাদেয় জাতীয় ইতিহাস জীবন্তমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে না।

আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, ভারতীয় মানবের ইতিহাস এখনও তাহার শেষ অধ্যায় প্রকটিত করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজও (প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত) সমগ্র বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে একাকী বিকাশ লাভ করে নাই; তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা যুগে যুগে বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র ও ভাবসমষ্টির অভ্যন্তরে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনকালে স্থানে স্থানে ভাষাসম্বন্ধে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ফাল্গুন, ১৩১৮ শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রবন্ধগুলির ভাষা

স্থানে স্থানে সরল করা হইল।

চৈত্র ১৩২০,
কলিকাতা। } শ্রীবিনয়কুমার সরকার।
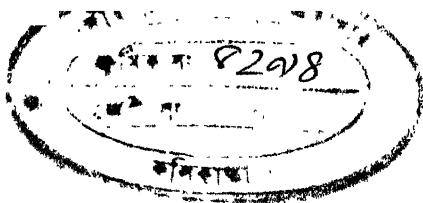
ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

ইতিহাসের উপদেশ

যথার্থ জীবন-তত্ত্ব বা প্রাণ বিজ্ঞান

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জীবের জন্ম হয়—কৈশোর-যৌবন-জরায় সে অনেক কাজ করে, অনেক চিন্তা করে, তার পর মরিয়া যায়। জীবনে মরণে, অভ্যুদয়ে পতনে, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার স্বকীয় বিশেষত্বের বিকাশ হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। যে উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্টি, লোকসমাজের জন্য যে কর্ম্ম ও চিন্তা করিবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত, পৃথিবীর যতটুকু কাজ করিতে সে উপযুক্ত, সেই পরিমাণ কাজ করিতে পারিলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য সফল হয়। এইরূপে তাহার মনুষ্যত্বের সম্যক্

ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অবস্থা, উন্নতি-অবনতি

বিকাশ করিবার জন্য তাহাকে অশেষ ঘটনা ও কার্য্যা-বলীর মধ্যে পড়িতে হয়। কোন সময় সে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করে, কখনও বা তাহার ফললাভ হয়ত অল্প। কিন্তু দিনের পর দিন, অবস্থার পর অবস্থা, সুফলের পর কুফল, অথবা অসুবিধা-সুবিধা, বাধা এবং সাহায্যের ভিতরেই ক্রমশঃ ব্যক্তিগত জীবন-কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইতে থাকে।

জাতীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি

জাতীয় জীবনেও ঠিক্ সেই ভাব। প্রত্যেক জাতি অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কাজ করে। এই উপায়ে বিশ্বের সমগ্র লোকসমাজের জন্য,—সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাহার যতটুকু দান করিবার আছে, ততটুকু দান করিয়া প্রত্যেক জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সফলতার অভিব্যক্তি করে। এই বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের বিকাশেই জাতীয় জীবনের সার্থকতা এবং ভগবানের অসীম ঐশ্বর্য্য ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই শেষ লক্ষ্য সাধনের পক্ষে অনেক দুর্য্যোগ সুযোগ উপস্থিত হয়,—সেই জন্য পৃথিবীতে যাবতীয় উন্নতি-অবনতি। কিন্তু যে অবস্থার ভিতর দিয়াই হউক, অবশেষে জাতিগত চরিত্রেরই বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ যে জন্য যে জাতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারই পূর্ণতা হইতেছে। পারিপার্শ্বিক যত শক্তি ও ভাবসমষ্টি রহিয়াছে, তাহাদের অনুকূলতায় বা প্রতিকূলতায়, স্বকীয় শক্তির যে বিকাশ বা হ্রাস হয়, তাহাও বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাধীন।

উত্থান ও পতন

জীবের জীবনে-মরণে যেরূপ, সমাজের অভ্যুত্থানে-অধঃ-পতনেও সেইরূপ ভগবদিচ্ছারই কাজ হইতেছে। পতন এবং মরণই জীবনের শেষ অবস্থা নয়। মৃত্যুতেই পুন-র্জীবনের বীজ রহিয়াছে; মনুষ্য সত্য সত্যই মরিয়া বাঁচিতেছে,—পুনরায় নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উদ্যম ও নূতন সাহসে সেই জীবন-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। সেই-রূপ সমাজও এক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবরে সেই অর্দ্ধসমাপ্ত জীবনের কর্ম্ম পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, অথবা অপরাপর সমাজকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা স্বকীয় জীবনধারা ও কর্ম্মসূত্রের দীর্ঘতা বৃদ্ধি করিতেছে।

কেবল মাত্র অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, অনুষ্ঠানেরই রূপান্তর দেখা যায়, ভাবের মৃত্যু হয় না;—চিন্তা অবিনাশী, —জীবন অসীম, আত্মা অমর কর্ম্মরাশির মধ্যে মানবের

ইচ্ছা বা চিন্তা বা জীবন প্রবেশ করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়; অথবা কতকগুলি উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া মানবের উদ্দেশ্য নিজকে প্রকাশিত করে। সেই কর্ম্ম বা উপলক্ষ্য, এবং সেই আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অথবা বিস্তৃতি হওয়া অসম্ভব নহে—বরং স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমুদয়ের উন্নতি এবং অবনতিতে,—উভয়েই ভগবানের শক্তির এবং ইচ্ছার সফলতা হইয়া থাকে। ভাঙ্গাগড়া দুই-ই ভগবানের লীলা। অনন্ত মঙ্গলময়ের বিধানে মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র, অমঙ্গলজনক নয়। ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্তের ন্যায় জাতীয় চরিত্রের ইতিহাসও এই উপদেশ প্রদান করে। উন্নতি-অবনতি এবং পতন-উত্থানের মধ্যে মানব-সমাজ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

ইতিহাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র

সমাজ-জীবনের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। জাতি-গত চরিত্রের উন্নতি-অবনতি, চিন্তাপ্রবাহ ও কর্ম্মস্রোতের পরিবর্ত্তন, ভাব-গঙ্গার জোয়ার-ভাটা, সমাজ-জীবনের অশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য আকার ধারণ করে। ভাষা বা সাহিত্যের বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, প্রজাশক্তির

ইতিহাসের আলোচ্য বিচিত্র আন্দোলন

অভ্যুত্থান, অথবা অজ্ঞান, অন্ধকার, অধর্ম্ম, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, প্রজাপীড়ন, রাজ্যধ্বংস ইত্যাদি আকারে সমাজ-জীবন মূর্ত্তি-গ্রহণ করে। এই জীবনের কাহিনী যে ইতিহাস, তাহা প্রকৃত পক্ষে একপ্রকার নীতিগ্রন্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্র। কারণ ইতিহাস-শাস্ত্রের বিষয়ীভূত এই নানাপ্রকার ব্যাপারের মধ্যে ভগবানের হাত দেখা যায়—এবং এই সমুদয় আলোচনা করিলে অনাদ্যন্ত অসীম শক্তির প্রভাব বুঝিতে পারিয়া জীবন গঠন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

প্রথমতঃ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবনে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন হইতেছে। তাহার দ্বারা ঈশ্বরের অসীমতার এবং বৈচিত্র্য-সৃষ্টির চিহ্ন প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিশাল নর-সমাজের মধ্যে এক একটি সম্প্রদায় বা জাতি, বিরাট্ সমাজ-কলেবরের এক একটি অঙ্গের ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অনন্ত-জ্ঞানীর কার্য্যবিভাগের শৃঙ্খলা ও নিয়মের পরিচয় দিতেছে। এই উপায়ে সকলের সমবেত চেষ্টায় এক প্রকাণ্ড বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্ববিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়া তাঁহার অসীম শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অপরদিকে জগতের এই সুশৃঙ্খলা, সুবন্দোবস্ত এবং বিশ্বমানবের ক্রমিক উন্নতি-বিকাশ বহু সত্য ও অসত্যের

দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিয়া সাধিত হয়। এই ক্রম-বিকাশের প্রণালীর মধ্যে বিজ্ঞানালোকে এবং অজ্ঞানান্ধকারে বহু বিরোধ উপস্থিত হয়, বহু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কলহ আসিয়া জুটে, অসংখ্য মতভেদ ও অনৈক্যের গোলমাল হয়, নানা প্রকার উৎপাত, উপদ্রব ও পীড়নের অবতারণা হয়। কিন্তু অবশেষে সমস্ত দুর্দ্দৈব ঘুচিয়া যায়, এবং মহাসত্যের বিকাশ, মহাদেশ ও মহাজাতির সৃষ্টি এবং প্রকৃত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হইতে থাকে। এই উপায়ে বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাস বিধাতার চিরমঙ্গল বিধানই খ্যাপন করে। তাহাতে সত্যেরই জয়, অসত্যের পরাজয়, অবিশ্বাসের নাশ এবং বিশ্বাসের সামর্থ্য, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ," এবং মিথ্যা ও অবিদ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—এই উপদেশের প্রচার হয়, এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

ফলতঃ ইতিহাস-বিদ্যা জাতীয় জীবনের কেবলমাত্র উন্নতি-অবনতির ছবি বা 'প্রতিকৃতি নয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করিতে যাইয়া তাঁহারই প্রেরিত লোক-সমাজ অসংখ্য প্রকার শিল্প, বিজ্ঞান, নানা কাব্যমাহাত্ম্য, বহু ধর্ম্ম ও স্বার্থত্যাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। অথবা হয়ত মানব নানা-

ইতিহাসে ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও নীতিকথা

প্রকার অধর্ম্ম, পাশবিকতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় দ্বারা সমাজে কষ্ট ও অত্যাচারের কারণ হইয়া বিদ্যা ও সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইতেছে। কিন্তু এই উন্নতি-অবনতির মধ্যে যে ঐশী শক্তির, যে অসীম জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেছে, ইতিহাস-শাস্ত্রে আমরা আনুষঙ্গিক ভাবে তাহারও পরিচয় পাই। সুতরাং এই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের পারম্পর্য্য-কাহিনী ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বিবরণীকে, ইতিহাসই বলা হউক বা সমাজ-নীতিই বলা হউক, মানবতত্ত্বই বলা হউক, বা সভ্যতা-বিজ্ঞানই বলা হউক, অথবা জাতীয়-জীবন-বিজ্ঞানই বলা হউক, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক অধ্যায়।

যথার্থ ইতিহাস বিজ্ঞান

অনেক ইতিহাস-গ্রন্থে এই ভগবৎপ্রেরণার উল্লেখ নাই। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও বিনাশের বিবরণ প্রদান করিয়া বহু ঐতিহাসিক ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি পাঠকের মন আকৃষ্ট করিতে পারেন না। ধনসম্পদের বৃদ্ধি বা হ্রাসের কাহিনী শুনিয়াও আমরা অনেক স্থলে এই পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব এবং বৈষয়িক উন্নতির অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে উপদেশ পাই না। নিত্য অবিনাশী আত্মার উৎকর্ষ

ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধন দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে না,—এরূপ ঐতিহাসিক আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু এই সকল আখ্যায়িকা ও আলোচনাকে আমরা যথার্থ জীবন-বিজ্ঞানের আলোচনা অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি না। এই সমুদয় আখ্যায়িকা কেবলমাত্র মারামারি কাটাকাটি, বা কল-কারখানার কোলাহল অথবা কুসংস্কার-পূর্ণ বাহ্যাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য বিবরণমাত্র—সমগ্র জীবন-তত্ত্বের, যথার্থ প্রাণ-বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। তাহাতে মানুষের আত্মার কথা নাই, মানুষের হৃদয়ের উল্লেখ নাই, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, মানুষের গন্তব্যস্থান কোথায়, কি উপায়ে কতদিনে তাহার শেষ লক্ষ্য সাধিত হইবে, এ সবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে বাহ্যজগতের যতটুকু দেখা যায়, তাহার কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা আছে মাত্র,—অন্তর্জ্জগতের, শ্রদ্ধাভক্তি-প্রেমের কোন উল্লেখ নাই। সেই আংশিক সত্যে জগতের নিয়ম বুঝা যায় না, জীবতত্ত্ব পরিষ্কারভাবে মনে স্থান পায় না। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে সমাজের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশিত

হইতেছে, এই শিক্ষা পাওয়া যায়, এবং আমরা মহাসত্যের ক্রমবিকাশের নিয়মগুলি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। এই উপায়ে মানুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া ইতিহাস-বিজ্ঞান জীবনের পথপ্রদর্শক হয়। ইহাতে ভগবানের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য স্থাপিত হয়, মানুষ বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে একমত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলজনক কর্ম্মে সহায়তা করিতে পারে।

মানবের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব-জীবন-বিষয়ক একটা মহা-নাটক

বাস্তবিক পক্ষে, নরসমাজের এই ক্রমোন্নতির উপদেষ্টা যে ইতিহাস-বিজ্ঞান তাহা মানবজাতির নৈতিক জীবন-বিষয়ক একটী মহান্ নাট্য-কাব্য। এই পৃথিবী এক বিশাল রঙ্গক্ষেত্র। এই মঞ্চে মানুষ বাল্য যৌবন জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনের নাটক বিভিন্ন ব্যক্তি এবং অপর সকল শক্তির সঙ্গে আদান-প্রদানে সমাপ্ত হয়। ইহার এক একটী দৃশ্য এবং অঙ্ক এই উপায়েই বিকশিত ও অভিনীত হইয়া থাকে। মানব-সমাজের চিত্র যে নাটকে অঙ্কিত হয়, তাহার চরিত্র এক একটী জাতি ও প্রতিষ্ঠান, এবং অভিনয় ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলন। জাতি-সম্মিলনে এবং আন্দোলন-সংঘর্ষণে বহু কর্ম্মের ও চিন্তার উদ্রেক হয়।

তাহারই ক্রমবিকাশে এই বিশ্ব-কাব্যের পূর্ণতা। সাধারণ নাট্যে নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিজে নিজের কর্ম্ম শেষ করিয়া নাট্যকারের রচনাকে সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করে, এবং এই উপায়ে তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে ফুটাইয়া তুলে। সেইরূপ পৃথিবীতে যত সমাজ বা জাতির স্থষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জগতের জ্ঞান ও সভ্যতা-ভাণ্ডারে স্বীয় দাতব্য দান করিয়া অপরের সহায়তা করে এবং এই উপায়ে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করে। এই বিশ্ব-নাটকের দৃশ্য ও অঙ্কগুলি বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ।

কাব্যে সদসতের দ্বন্দ্ব

কবি তাঁহার কল্পিত চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে কতকগুলি তত্ত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিযোগিতা অথবা মিলন, সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি অন্তর্জ্জগতের শক্তিপুঞ্জের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পাঠকগণ সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। মানব-কবির বিচারে প্রায়ই ন্যায়ের কৃতকার্য্যতা এবং অত্যাচারীর দণ্ড, প্রেমের জয় এবং হিংসাদ্বেষের পরাজয় ইত্যাদি পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনের সত্যগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরন্তু বিশ্বকবি-রচিত এই মহান্

নাট্য-গ্রন্থে অনেক সময়ে পাপের আস্ফালন, নাস্তিকতার অপ্রতিহত গতি, ও সয়তানের অবাধ রাজ্যভোগ দেখা যায়। কিন্তু সমস্তই মঙ্গলময়ের ইচ্ছার অধীন বলিয়া, এই সব অসত্য, অবিদ্যা, মোহ-তিমিরই ভবিষ্যৎ উন্নতির এবং সত্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস, এই আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, বর্ব্বরতা ও সৌজন্য ইত্যাদির বিরোধ-রূপ অসত্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইতেছে।

ইতিহাস-নাট্যে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিপথ প্রদর্শন

ক্রমশঃ বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ক্রমশই লোক নূতন নূতন উপায়ে পরোপকার, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবদ্‌ভক্তির নব নব পথে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমশই বাহ্য ও মনোজগতের নিয়মগুলি মানুষ করতলগত করিতেছে। মানব-সমাজে ক্রমে ক্রমে জাতীয়তার বিকাশ, প্রজাতন্ত্র-শাসন ও জনসাধারণের অভ্যুদয়, এবং শ্রমজীবীদের উচ্চতর প্রতিষ্ঠালাভ, ইত্যাদি বিচিত্ররূপে উন্নতির পন্থা পরিষ্কার হইতেছে। কিন্তু উন্নতির প্রত্যেক ধাপেই এক একটী সংগ্রাম। সভ্যতার প্রত্যেক স্তরেই মানুষকে মঙ্গল ও অমঙ্গল, বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিতে হইতেছে। শুভ এবং অশুভের এই চিরন্তন বিবাদ ঘুচাইয়া

দিয়া মনুষ্যসমাজ ক্রমে শুভের পথেই যাইতেছে এবং মঙ্গলেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। এজন্য সভ্যতার ইতিহাস একটী বিশ্ব-নীতিমূলক মহা-নাটক। ইতিহাসের প্রতি পর্য্যায়ে, জাতির সঙ্গে জাতির প্রত্যেক আদান-প্রদানে, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং প্রত্যেক স্বাধীনতার আন্দোলনে "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়"—শ্রুতির এই বচন কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এজন্য এই ইতিহাস-নাট্য-ধর্ম্মগ্রন্থেরই এক অংশ।

ইতিহাসে বিদ্যা ও অবিদ্যা

'অসতে'র উৎপত্তি

এ জগতে কেন যে অমঙ্গল ও 'অসতে'র সৃষ্টি হয় বলা কঠিন। ভগবান্ যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য,—তবে সমাজে এত অহঙ্কার, এত অনৈক্য, এত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি কেন? সংসারে এত দাসত্ব, পরাধীনতা কেন? অবিশ্বাস, নৈরাশ্য, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারই চিত্তকে অনেক সময় ভরিয়া রাখে কেন? এক একটী ফুল ফুটিতে বা প্রাণীর সৃষ্টি হইতে অসংখ্য জীবের নাশ হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষ-জনক

উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কোন উত্তরই শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসার সহায় হইতে পারে না। হয়ত কোন এক মঙ্গলবিধান চিরকাল একভাবে থাকিলে অমঙ্গলজনক হইয়া সংসারে ও সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট সৃষ্টি করে,— শুভ অনুষ্ঠানই পরে অশুভের কারণ হয়। এক যুগে যাহা শুভ, অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী যুগে তাহাই বিষময় ফল প্রদান করিতে থাকে। তখন আবার তাহার সংশোধন না হইলে চলে না। অথবা হয়ত কোন এক সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কিছুকাল নর-সমাজের উপকার করিয়া কিছু শক্তি বা অধিকার প্রাপ্ত হইল। পরে সেই অধিকারের এবং প্রভুত্বের অহঙ্কারই তাহার কার্য্যকলাপে অত্যাচার ও ব্যভিচারের উৎপত্তি করে। অধিকার এবং ক্ষমতাই অনর্থের মূল হয়। তখন অধিকারের এবং শক্তির পুনরায় বিভাগ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

যে কারণেই হউক, জাগতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনেই হউক অথবা ক্ষমতার স্বাভাবিক নিয়মে ও প্রকৃতিতেই হউক, সংসারে অমঙ্গল, 'অসৎ', 'মার' আসিয়া জুটে। আমরা তাহাদের পূর্ব্বাপর অবস্থা মাত্র দেখিতে পাই এবং ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্যই বর্ণনা করিতে পারি, তাহাদের মূল কারণ অবধারণ করিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র জানিতে পারি যে,

এই এই অবস্থার পর অমুক অমুক ঘটনা ঘটিয়াছিল, এজন্য আজ এইরূপ হইয়াছে ; অথবা কোন সমাজ পূর্ব্বে জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত ছিল, পরে অধর্ম্মে মূর্খতায় একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে ; অথবা কোন স্থানে অনেক দলাদলি গৃহ-বিবাদের পর জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। আমরা জগতের কতকগুলি ঘটনা ও চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু অধীনতার ভিতরে থাকিয়া কেন সমাজকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, অথবা মানুষ কেন সয়তানের পরামর্শে কিছুকাল চলিবার পর ভগবানের উদ্দেশ্যে চলিতে শিখে এবং প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা বলা যায় না।

সদসতের সম্বন্ধ

আমাদের শাস্ত্রে পাপ-পুণ্য দুই-ই ভগবানের ইচ্ছার অধীন—দুই-ই ভগবানের সৃষ্ট, দুই-ই সনাতন এবং বিশ্বের সৃষ্টিকালাবধি জগতে বর্ত্তমান। তবে তাঁহারই বিধানে, তাঁহারই ব্যবস্থায় সত্য এবং পুণ্য দ্বারা মিথ্যা এবং অসত্য সর্ব্বদা পরাজিত হইতেছে, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হইতেছে। জ্ঞান এবং ধর্ম্মের গতি অনেক সময় বাধা-প্রাপ্ত হয় বটে, 'মারে'র প্ররোচনায় অনেক সময় মন কুসংস্কারে পূর্ণ হইতে পারে বটে, এবং মায়াজালবদ্ধ

হইয়া চিত্ত অনেক সময় স্বাধীনতা হারায় বটে, কিন্তু সংসারে পাপের আধিপত্য অল্প কয়েকদিনের জন্য, অচিরেই অধর্ম্মের রাজ্য লুপ্ত হইয়া যায়। বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি প্রথমে ক্রমাগত হইতে থাকে না, কিছুদিন বৃদ্ধির পর হঠাৎ হয়ত দুই চারি দিন কিছু হ্রাসই হয়, কিন্তু তার পর আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে হ্রাসের পর বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর হ্রাস হইতে হইতে শেষ পর্য্যন্ত নদী বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকে। তেমনি পুণ্যের গতি কখনই সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইতে পারে না। রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার মাঝে মাঝে দু'টা একটা যুদ্ধে পরাজয় এবং ক্ষণিক বিফল প্রয়াসের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীতে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সাম্রাজ্য পাপ ও অবিদ্যার দ্বারা মাঝে মাঝে হতশ্রী হইলেও, কখনই বিনষ্ট হইবার নহে, বরং অজ্ঞান এবং অধর্ম্মকে পদানত করিয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে।

বিবিধ সয়তান সৃষ্টি

এই জন্য বিশ্ববিধাতার নিয়মে অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, মায়া, মূর্খতা, গোলামী এবং সন্দিগ্ধচিত্ততার ভিতর দিয়াই মানবকে জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়। বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপু ভগবানেরই কাজ করিতেছিলেন,—ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁহার স্রষ্টা। ব্রহ্মার

বরে বলীয়ান্ হইয়াই দৈত্য হিরণ্যকশিপু এত অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যত দৈত্যদানব অসুর প্রভৃতি দেবদ্বেষী সমাজের কথা আমরা জানি, প্রত্যেকেই ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারই কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। কংসের উপদ্রব ভগবানের অবিদিত ছিল না। আবার দেবগণ যখন রাবণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া উদধিতীরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, ভগবানের সেই সময়কার কথায়ও বুঝা যায় যে, যাহাকে আমরা অমঙ্গল ও অশুভ বলি, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনের জন্য তাহারও প্রয়োজন, সংসারে তাহারও প্রয়োজন আছে। রাবণ বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এরূপ বরলাভ করিয়াছিল যে, কোনও দেবতা তাহাকে নিধন করিতে পারিবেন না। তাই তাহার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং দাশরথি হইয়া তাহার উচ্ছেদের কারণ হইলেন।

আশাতত্ত্ব

অতএব দেখিতে পাই, সমস্ত অমঙ্গলই ভগবানের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু

মানুষের সসীম জ্ঞানের পরিধি অতি অল্প। দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার শক্তি আমাদের নাই।

মানবজাতির ইতিহাসোলোচনায় দূরদৃষ্টিপাতের প্রয়োজন

এজন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিতে পারি না। একটী নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই কোন্ সত্য প্রচারের জন্য কবি অভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু বিশ্ব-কবিবরের কোন্ মহামন্ত্র জগতের ইতিহাস-রচনার মূলে তাহা জানিব কি করিয়া? সভ্যতার শেষ অঙ্ক কোথায়, বিশ্ব-নাট্যের শেষ দৃশ্যে কোন্ বিদ্যা প্রচারিত হইয়া কোন্ অসত্যকে দলন করিবে, তাহা অবধারণ করা অসম্ভব। মানবেতিহাসের শেষ অধ্যায় কখনও আসিবে কি? জগৎ যে ক্রমশই বিকশিত হইতেছে—মানব-জীবন যে চিরপ্রকাশমান। অসীম অনন্তশক্তির পরিচয় পাইতে হইলে কত যুগান্তরের সৃষ্টি দেখিতে হইবে, কত বিশ্বের লয় দেখিতে হইবে, কত শত জাতির পতনোত্থান দেখিতে হইবে, কত লক্ষ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গাগড়া দেখিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র ঐতিহাসিকের সাধ্য নাই।

দু' একটি দৃশ্য মাত্র আমাদের স্মৃতিপথে আছে বা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যের পর

বৃহত্তর সত্যের বিকাশ হইয়াছে দেখিতে পাই। তাহা হইতে এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, ক্রমশঃ মহাসত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে মানবজাতির চিন্তা ও কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখিতে উপদেশ দিয়াই ঐতিহাসিক ক্ষান্ত হইতে বাধ্য। আশা-তত্ত্বই ইতিহাস-বিজ্ঞানের শেষ কথা।

বিপ্লব

জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে সময়ে সময়ে নবনব চিন্তা ও কর্ম্ম-ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ নূতনের প্রবর্ত্তনকে বিপ্লব বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা ইতিহাসের স্তম্ভ-স্বরূপ। এইশ্রেণীর যে কয়জন ব্যক্তি অধর্ম্মের এবং অবিদ্যার বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের এবং জ্ঞানের গণ্ডী বিস্তৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ জ্ঞানে আমরা পূজা করিয়া থাকি।

মহাপুরুষের কার্য্য অসত্যনাশ ও যুগ-প্রবর্ত্তন

যুগ-প্রবর্ত্তক

সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে চিন্তা ও কর্ম্মের অসংখ্য আদানপ্রদান হয়। সমস্তই পাপ ও পুণ্য, মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিয়া সত্য এবং বিজ্ঞানের বিস্তৃতিই করিতেছে। সর্ব্বদা সকল স্থানেই এই বিরোধ এবং এই সমন্বয় চলিতেছে। মানুষ মাত্রেই এক একটী বীর, —অসতের পরাজয় করিয়া 'সৎ'-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার জন্ম। প্রত্যেক মানবেরই এই কার্য্য। তবে অনেক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর বা সমস্ত জাতির চরিত্রেই অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নাস্তিকতা এবং পার্থিব সুখপ্রিয়তার দিকে

ধাবিত হয়। সেই সময়ে "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ", "অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য" হইয়াছে বলা যায়। তখন সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না; দুষ্টের পালন এবং শিষ্টের দমন হইতেছে, সর্ব্বত্র অবিচার-অন্যায় চলিতেছে। এরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় যে দুইচারিজন কাণ্ডারী আসিয়া দেশ-তরণীকে প্রকৃত সত্যের পথে চালাইতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আমরা বীর বা মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বলিয়া থাকি।

মহাপুরুষের অলৌকিকতা

আমরা বিবেচনা করি যে, তাঁহাদের মধ্যেই ভগবানের শক্তি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, তাঁহারাই বিশ্বনিয়ন্তার পরিচিত প্রিয়জন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম, চিন্তা বা প্রেমের দ্বারা ঝড়তুফানের সময় শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভক্তি বিস্তারপূর্ব্বক অসুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেবতার রাজ্য গড়িয়া তুলেন, খণ্ডসত্যের স্থানে মহাসত্যের আবিষ্কার করেন, ক্ষুদ্রস্বার্থ সমাহিত করিয়া জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি করেন। এরূপ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাঁহারা বিশেষভাবে ভগবানের লোকরূপে অবতার নামে খ্যাত হন। সমাজ এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে যে পথে চলিয়া থাকে, সে পথ তাঁহাদেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহাদের পরবর্ত্তী সমাজ যে ভাবে

জ্ঞানার্জ্জন, সাহিত্যানুশীলন, ধর্ম্মচর্চ্চা, নৈতিকজীবন-গঠন, পারিবারিক এবং সামাজিক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলে, তাহা সেই মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তিগণের পন্থা দ্বারা প্রবর্ত্তিত, এবং সেই যুগ তাঁহাদের নামে অভিহিত হয়।

এই জন্য বীরগণের জীবনীই জাতীয় ইতিহাস, কারণ পূর্ব্বাপর সমস্ত বীরের কার্য্যের সন্ধান যদি আমরা পাই, তাহা হইলে অনায়াসেই বীরপ্রসূ জাতির সকল কার্য্যকলাপের বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়। বীরগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমাজের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারা যায়। কোন্ সময়ে কোন্ সত্যের আবিষ্কার, কখন কোথায় কোন্ ভাবের লোপ হইল ইত্যাদি ভাব ও কর্ম্মের ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিতে পারা যায়।

মহাপুরুষ ও জনসাধারণ

অবশ্য জনসাধারণও প্রকৃতিপুঞ্জের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী জাতীয় জীবনের ইতিহাস-কথায় একেবারে নগণ্য নহে। বীরেরা সাধারণ জনসমাজের নেতা এবং শিক্ষক। নূতন আলোক লইয়া আসিয়া তাঁহারা তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর

করেন। তাঁহারা নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার-কর্ত্তা। কিন্তু সাধারণ সমাজ যদি একেবারে স্পন্দনহীন অচেতন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে এই অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সেই শিক্ষাদান বিফল হয়। সুতরাং সকলকে সেই শিক্ষার অধিকারী করিয়া লওয়া বীরগণের কাজের মধ্যে পরিগণিত।

অধিকন্তু, সাধারণ লোকসমাজও বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ মহাপুরুষগণকে অনুগমন করিবার উপযোগী শক্তি বহন করে। এই জন্য অনেক সময়ে সেই জনসমাজের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের কর্ম্মের ও যশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মহাপুরুষেরা সাধারণ লোক-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের স্বভাব এবং অভাবের অনুরূপ কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন। এজন্য সাধারণ জনগণের জীবনপ্রবাহ বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তৎকালীন সমগ্র সমাজের বিবরণ পাওয়া যায়। বীরগণের কৃতিত্বও কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ জন-সমাজের সঙ্গে মহাপুরুষগণের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে, তাঁহারা দেশীয় লোকবৃন্দকে অনেক বিষয়ে অনুসরণ না করিলে তাঁহাদের কাজে জগতের মঙ্গল বেশী হইত না এবং তাঁহারা যুগপ্রবর্ত্তক

হইতে পারিতেন না। অতএব জাতীয়-জীবন-বিকাশের ইতিহাসে জনসাধারণের কৃতিত্ব বড় অল্প নহে।

এই কারণে জগতের ইতিহাস একদিকে যেমন বীরপুরুষদেরই বীরত্ব-কাহিনী, অপরদিকে ইহা জন-সাধারণেরও অভ্যুত্থানের কথা। সভ্যতা ও সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কর্ম্মী কেবল বীরেরাই নহেন; সাধারণ লোকেরাও ইহার প্রধান অবলম্বন।

যুগধর্ম্মের বৈচিত্র্য

জগতের ইতিহাস সর্ব্বদা এক ভাবে চলে না। বিশ্বনাটকের কোন এক অঙ্ক বা দৃশ্য অপর কোন অঙ্ক বা দৃশ্যের অনুরূপ নয়। অবস্থাভেদে কার্য্য ও চিন্তার এবং বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মানুশীলনের ব্যবস্থার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। এই জন্য লোকসমাজের এবং বীরপুরুষদিগের কার্য্যও দেশ-কালপাত্রানুসারে পৃথক্ হইয়া থাকে। এক এক সময় এক এক কাজের জন্য ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রেরিত হন। অবিদ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে,—কখনও প্রজাপীড়ন এবং অরাজকতা, কখনও অসাম্য এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, কখনও নাস্তিকতা

বিপ্লবসমূহের বিভিন্নতা

এবং যথেচ্ছাচার। এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসত্য নাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য পৃথিবীতে যত বিপ্লব, যত যুগান্তর, যত প্রলয় হয়, প্রত্যেকটাই ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা। কোন দুই "রিভলিউশন" বা বিপ্লবের আকৃতি ও প্রকৃতি একরূপ নয়।

বিপ্লবের প্রকৃত তত্ত্ব

আর বাস্তবিক পৃথিবী অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। জগতের, কি বাহিরের, কি ভিতরের অবস্থার স্থিরতা নাই। সর্ব্বদা রূপান্তর হইতেছে, ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া বিশ্ব নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সেই জন্য পৃথিবীতে হঠাৎ কোন এক বিপ্লব উপস্থিত হয় না। যাহাকে আমরা বিপ্লব বলি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রমবিকাশ। অনেক দিনের চেষ্টার ফলে, অনেক শক্তির সমুচ্চয়ে, অনেক কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাভাবিক আন্দোলনে যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। তবে কোন কোন স্থলে ঘটনাস্রোত ও চিন্তার পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আমাদের হয়ত জানা থাকে না। এই কারণে বিশ্বব্যাপী কয়েকটা আন্দোলনকে বিপ্লব বলিয়া থাকি। এই যে ডিমক্রেসী বা স্বরাজ, সায়েন্স বা বিজ্ঞান, সোশ্যলিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীর অভ্যুদয় আজকাল পাশ্চাত্য জীবনের সমস্ত

ব্যাপারেই লক্ষিত হয়, তাহা অনেক শতাব্দীর বহু অধিকার-চ্যুতি, অবিচার, উৎপীড়ন, কুসংস্কার প্রভৃতির বিনাশ-সাপেক্ষ বহু সমবেত চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল।

যাহা হউক, আন্দোলনসমূহ সময়োপযোগী, এজন্য যুগে যুগে বিচিত্র রূপে ও বিভিন্ন আকারে উপস্থিত হয়।

কয়েকটি ঐতিহাসিক বিপ্লব-আলোচনা

গ্রীকজাতির অভ্যুদয়কালে রাষ্ট্রনৈতিক-ক্ষেত্রে শাসনপ্রণালীর সংস্কার উদ্দেশ্যে যে যে আন্দোলন হইয়াছিল, অথবা চিন্তাজগতে নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারের যে যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, সেই সব আন্দোলন রোমের আন্তর্দ্দেশিক সংগ্রাম বা রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং ধ্বংসরূপ যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহাদের মত নয়। আবার মধ্যযুগে ধর্ম্মগুরু পোপের অত্যাচার এবং কুসংস্কার ও মুর্খতার বিরুদ্ধে ভেরী নিনাদিত হইয়া নবীন যুবকদিগকে যে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সাধনা, নূতন শিক্ষা এবং নূতন কর্ম্মপ্রণালীর জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে রণবেশে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাও অন্য কোন বিপ্লব বা আন্দোলনের অনুরূপ নয়। এইরূপে ইংলণ্ডীয় গৃহবিবাদ, রাজা-প্রজার কলহ এবং কনষ্টিটিউশন্যাল আন্দোলন, ফরাসী-দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব এবং প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

বিপ্লবসমূহের বিভিন্ন লক্ষ্য

প্রত্যেক আন্দোলনই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আন্দোলনকারী ও কর্ম্মীদের স্বভাব ও চিন্তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কোন বিপ্লব প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি উহার মূল উদ্দেশ্য, ঈশ্বরে লোকবৃন্দের বিশ্বাস আনয়নই প্রধান লক্ষ্য। কোন কোন সময়ে শিল্পবাণিজ্যসম্বন্ধীয় এবং আর্থিক উন্নতিকল্পেই জাতীয় শক্তির স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হইয়া থাকে। কখনও রাজা-প্রজার সম্বন্ধের উন্নতিবিধান করিয়া সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপে প্রজার অধিকার-স্থাপনই প্রধান লক্ষ্য থাকে। কখনও বা সমাজসংস্কার, যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতা-বিভাগ, এবং সমাজে মান ও খ্যাতির সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদিই লোকের চিন্তার বিষয় হয়। কখনও বিদ্যা-শিক্ষার প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

বিপ্লবের ব্যাপকতা

অবশ্য মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম পরস্পর-সম্বদ্ধ।

সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতিতে, অথবা ধনসম্পদের হ্রাসে বা বৃদ্ধিতে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অপরাপর সকল বিষয়েই উন্নতি-অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং নিতান্তই স্বাভাবিক। ফরাসী-বিপ্লবে কেবল কি প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠাই হইয়াছে? শিল্প, ভাষা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ প্রত্যেক বিষয়েই স্বাধীন-চিন্তার ঢেউ, এবং নবজীবনের প্রবাহ আসিয়া ইউরোপকে আঘাত করিয়াছে—একটা নূতন ইউরোপই গড়িয়া উঠিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মের আন্দোলন কেবল ধর্ম্মজীবনেরই উৎকর্ষ বিধান করে নাই। তাহার ফলে রাজাপ্রজার কর্ত্তব্য, জাতীয় ঐক্য, বিদ্যাশিক্ষা, জাতির সঙ্গে জাতির আদান-প্রদানের নিয়মপদ্ধতি, কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ের আদর্শ এবং কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়ই রূপান্তরিত হইয়া নূতন আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে। উইক্লিফ, লুথার, ক্র্যান্মার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কি কেবল মাত্র ধর্ম্মবীরই ছিলেন? তাঁহারা সমাজ-সংস্কারক এবং নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তকরূপেও সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। সেইরূপ ভল্টেয়ার ও রুসো প্রভৃতি ফরাসী-বিপ্লববাদিগণ রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনমাত্রের প্রধান অবলম্বন ছিলেন না; চিন্তাজগতে—শিক্ষাবিজ্ঞান এবং

বিপ্লবের আনুষঙ্গিক ফল

পদার্থবিজ্ঞান, সমাজনীতি এবং সাধারণ সাহিত্যসংসারেও অধিকার তাঁহাদের বেশ ছিল।

কোন এক বিপ্লব সাধিত হইলে জনসমাজের প্রায় সকল বিভাগেই একটা নাড়াচাড়া না হইয়া যায় না। একটা অবিদ্যার ধ্বংস আরম্ভ হইলে নানাপ্রকার অবিদ্যার সিংহাসন সেই সঙ্গেই টলিতে থাকে। মানুষ কোন এক দিক হইতে আলোক পাইলে, কোন এক রাজ্যের অন্ধকার কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, সকল দিকেই তাহার অন্ধতা ও অজ্ঞতা দূরীভূত হয়, সকল ক্ষেত্রেই সে দিব্য চক্ষু লাভ করে।

গ্রীক ও হিন্দু

সকল জাতির সভ্যতার মধ্যে মানবের এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মানব বিশ্বকে যে ভাবে দেখিয়াছে, বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ এবং ইহার মধ্যে নিজের স্থান বিষয়ে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার জীবন ও কর্ম্মের অভ্যন্তরে সেই ভাব ও ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র—প্রাধান্য বা ব্যক্তিত্ব-বিনাশ

প্রাচীন গ্রীক-সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতিতেই জাতীয় উন্নতি-অবনতি সাধিত হইত। রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধনই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেই সকলে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করিত। কোনও গ্রীকই স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রাতিরিক্ত জীবন অতিবাহিত করিত না। রাষ্ট্রের সামাজিক জীবন-প্রবাহের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিত। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিধি-নিষেধ, সমস্তই রাষ্ট্রীয় মঙ্গল-

চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহারা শিক্ষালাভ করিত—সমাজের উপকার করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য। তাহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিত ও সঙ্গীত শিক্ষা করিত,—রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য। শিল্পী, কবি, গায়ক, লেখক, ভাস্কর, যোদ্ধা, পণ্ডিত ইত্যাদি সকলেই সাধারণতন্ত্রের বিবিধ উপকার সাধন করিবার জন্য নিজ নিজ শক্তির প্রয়োগ করিতেন। রাষ্ট্রকে বিচিত্র উপায়ে সুসজ্জিত ও ভূষিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্যই গ্রীকগুণিগণ নিজ নিজ বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইতেন। জন-সাধারণের কর্ম্মে সময় দান করিতে না পারিলে, অথবা এতদুপযোগী শক্তির অভাব বোধ করিলে, তাঁহারা জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিতেন।

বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিতে যাইয়াই গ্রীকেরা ন্যায়শাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গদ্য-সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের ওজস্বিতা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য, তাহাদের কলাবিদ্যা, তাহাদের কারু-কার্য্য সকল বিষয়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্র তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসায়, সাহিত্য, চিন্তাপদ্ধতি প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগই নিয়ন্ত্রিত

করিত। ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের নিয়মপালনই চরম লক্ষ্য মনে করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিত।

গ্রীক জাতির সৌন্দর্য্যবোধ

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনসমূহ বিশাল সামাজিক জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করাই গ্রীকসংসারে নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধই এই নীতি-প্রবর্ত্তনের প্রধান কারণ।

গ্রীকেরা সকল বিষয়েই সৌন্দর্য্য এবং সামঞ্জস্যের আদর করিত। তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-বোধের প্রভাব দেখিতে পাই। তাহার প্রভাবে গ্রীকসমাজে বাহ্যসুন্দর ও অন্তঃসুন্দর ব্যক্তিগঠনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব-প্রিয়তাই তাহাদিগকে মন্দির-প্রতিষ্ঠায়, মূর্ত্তিগঠনে, চিত্র-কর্ম্মে ও বিবিধ স্থাপত্যকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা সঙ্গীত-চর্চ্চাও করিত।

গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিচিত্র। মানব-শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মানবচিত্তের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের কষ্টি-পাথর। এই সর্ব্বাঙ্গীণতা ও

সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, প্রথমতঃ, তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্য ও চিন্তাসমূহকে কোন নির্দ্দিষ্ট এক কেন্দ্রে পরিচালিত করিয়া সকলগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিত। ফলতঃ জীবনে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হইত। তাহারা সঙ্গীত-বিদ্যাকে অন্তরঙ্গের ব্যায়াম মনে করিত এবং উহার দ্বারা চিত্তের অসামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য দূরীভূত করিয়া সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা প্রদান করিতে উৎকণ্ঠিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার প্রভাবেই আবার তাহাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন-প্রিয়তা পুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবনগুলি রাষ্ট্রের সাধারণ আদর্শ ও লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিত। এই উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও অঙ্গাঙ্গিভাব আনয়নের চেষ্টা থাকিত। ইহার ফলে তাহারা রাষ্ট্রের সাধারণ উন্নতিতেই আপন আপন জীবনের সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত।

পার্থিব ঐক্য ও সামঞ্জস্য

এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধের গভীরতর কারণ আছে। প্রাচীন গ্রীসে ইহজগতের কর্ম্মক্ষেত্রই বিশ্বরূপে বিবেচিত হইত। গ্রীকেরা মানবজীবনকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে

আবদ্ধভাবে দেখিত। এই কর্ম্মক্ষেত্রেই এক জন্মের মধ্যে নিজ নিজ জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা থাকিত। কিন্তু মানুষের দৈনিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও অনৈক্য সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। সেই সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য গ্রীকেরা একটা বৃহত্তর পার্থিব শৃঙ্খলা ও ঐক্যের অনুসন্ধান করিতে প্রয়াসী হইত। এইরূপ কোন শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাহারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যসমূহ বিসর্জ্জন করিত। এই কারণে বৈচিত্র্যসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। এই জাগতিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাই গ্রীক সভ্যতার বিবিধ অঙ্গ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাধান্য, শিল্পে আকৃতিসৌষ্ঠবের গৌরব, সঙ্গীতচর্চ্চার আদর এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যায়াম ও সঙ্গীতের প্রভাব এই পার্থিব সামঞ্জস্য-জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সকল বিষয়েই তাহারা পার্থিব অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব যথাসম্ভব দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের আদর্শ ও লক্ষ্য—মুক্তি

ভারতবর্ষে যে সভ্যতা ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বীজমন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন ভারতের বিবেচনায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জ্জন সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষ এক নূতন ধরণের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিল। হিন্দুজাতি এক অভিনব ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়াছিল।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশ

এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশই বিশ্বসৌন্দর্য্যের এক মাত্র লক্ষণ বিবেচিত হইত। সমাজের সাধারণ জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিচিত্র জীবনধারাসমূহ নিমজ্জনের দ্বারা সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ সাধন করাই আদর্শ ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-প্রবাহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের, বিশ্বজগতের এবং বিরাট্ ঐক্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত। এই উপায়ে ভারতবর্ষের নরসমাজ সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। হিন্দুসংসারে মানবের বর্ত্তমান নগণ্য জীবনের সামান্য কর্ম্ম ও চিন্তাসমূহের মধ্যে মহান্ অনন্ত যুগযুগান্তব্যাপী জন্ম-মরণাতীত ভবিষ্যতের মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইত।

ভারতবর্ষ এইরূপে সসীমকে অসীমের, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার, অবিদ্যাকে বিদ্যার, মৃত্যুকে অমৃতের ও বন্ধনকে মুক্তির মহিমা দান করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিচারে পরবশতায় দুঃখের উৎপত্তি হয় এবং আত্মবশতাই সুখ। সেই মহৎ দুঃখের নিবৃত্তিসাধন এবং সেই চরম স্বাধীনতা লাভ ও মোক্ষলিপ্সাই হিন্দুসংসারের সকল কর্ম্ম ও ভোগের নিয়ন্তা এবং শেষ লক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। ভারতবাসী ব্যক্তিগত জীবনে নিখিলকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধান করিত। এই জন্য ভারতবর্ষের মানব বর্ত্তমান সামান্য অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ভবিষ্যতের সহিত যোগ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত এবং নিজ নিজ স্বতন্ত্র উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়া পরমানন্দ ও অমৃতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত।

হিন্দুধর্ম্মের ব্যক্তিত্ব-বাদ

(১) ব্যক্তিত্ববিকাশে জীবনের সার্থকতা ও মুক্তি (২) পরকালবাদ— প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তি

এই সসীম ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অসীম ও ঐক্যের উপলব্ধিই হিন্দু জাতির বিচিত্র ধর্ম্মভাবের কারণ। এ জন্যই তাহারা প্রত্যেক আত্মার ক্রমিক উন্নতি লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার ফলেই ভারতবর্ষে মানবের

দেবত্ব সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছিল। ভারতবাসী সহজেই বুঝিতে পারিত যে, মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশের অভ্যন্তরে পশুত্বের ক্ষয় হইয়া দেবত্বের অভিব্যক্তি হয়, এবং সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম্মেরই ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইতিহাস-বিজ্ঞান ধর্ম্মগ্রন্থেরই এক অধ্যায়—এই সত্য হিন্দুজগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অনন্তবোধের প্রভাবে এবং অসীমে প্রীতির জন্যই হিন্দুজাতি পরকালবাদ স্বীকার করিত, আত্মার মুক্তিলাভ সম্বন্ধে ক্রমিকতা ও স্তরবিভাগ স্বীকার করিত, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে প্রত্যেক জীবের বিচিত্র স্থিতি ও 'অধিকার' বুঝিতে পারিত এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান মানিয়া লইত। এজন্য ভারতবাসী ব্যক্তিমাত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আশা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশ

বৈচিত্র্যের মর্য্যাদারক্ষার প্রবৃত্তিই হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণ। হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বিচিত্র ধর্ম্মভাবই আবার সমাজ-

জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষের সাধারণ সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে ইহজগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সাংসারিক অনৈক্য এবং জাগতিক অসামঞ্জস্য এখানে বিশেষ ভীতিকর বোধ হইত না। বরং সমাজের বিচিত্র শ্রেণীবিভাগ, অধিকারবিভাগ, কর্ত্তব্যবিভাগ এবং জাতি-বিভাগ সাধিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্পূর্ণতালাভের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইত। ফলতঃ প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও লৌকিক পথ আবিষ্কৃত হইতে পারিয়াছিল। স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরম সত্যের উপলব্ধিই ভারতসমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে নিজ নিজ পরিপূর্ণতাবিধানোপযোগী বিভিন্ন রীতিনীতি, বিভিন্ন বিধিনিষেধ, বিভিন্ন আশ্রমবিভাগ, বিভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, এবং ঘোর অনৈক্য ও জটিলতার সৃষ্টি হইত। ভারত সমাজের অভ্যন্তরে এই উপায়ে মহান্ বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী

অধিকারিভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লাভের সুবিধা

হইয়াই হিন্দুরা বিবাহপদ্ধতিতে, শ্রাদ্ধের কার্য্যকলাপে ও অতিথিসৎকারে বিশ্বজগৎকে এবং যুগযুগান্তকে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে বসাইয়া ব্যক্তিগত জীবন-ধারণকে বিশাল, উদার ও মহান্ করিয়া তুলিত।

এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তা এবং অনন্ত বোধের প্রভাবেই তাহাদের সমাজপদ্ধতিতে ব্যক্তির স্থান সকলের উচ্চে থাকিত। ভারতবর্ষ বুঝিয়াছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক অবস্থা আছে, এমন এক প্রবৃত্তি আছে, যাহা সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী, যাহার উপর পরিবারের কোন আধিপত্য নাই, যাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের অতীত।

ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের আয়ত্ত নহে

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে বিরাট্ ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করাই ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য। এজন্য সংকীর্ণ এবং অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অনায়ত্ত এক স্বাধীন অবস্থা উপভোগ করা প্রত্যেক মানবের অত্যাবশ্যক।

এই স্বাধীন অবস্থা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকিলে এবং এই চরম স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় বিকাশ, আনন্দ ও মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ইহাতেই জীবনের সফলতা, মনুষ্যত্বের সার্থকতা,—মানবের দেবত্বপ্রাপ্তি। সুতরাং ব্যক্তিগত

জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধনই ভারতবর্ষের আদর্শ হইয়াছিল। এই সত্য উপলব্ধি করিবার ফলেই তাহারা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অধিকার খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তিকে সকলের ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিল। এজন্যই তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম বিভাগ করিয়া সেই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায়স্বরূপ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

হিন্দু শিক্ষা-বিজ্ঞানে মুক্তিতত্ত্ব

এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তা এবং অসীমে প্রীতির জন্যই তাহারা কর্ম্ম, ভোগ, সংসার ও প্রবৃত্তির সঙ্গে জীবনের এক এক অবস্থায় ত্যাগ, সন্ন্যাস ও নিবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক পূর্ণ মানব গঠন করিতে প্রয়াসী হইত।

চরমে মুক্তিলাভোপযোগী চারি আশ্রম বিভাগ—শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি

তাহারা ইন্দ্রিয়ের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করিত না—তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের প্রভাব বিস্তার করিত। ইহার ফলেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একরূপই থাকিত না। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে হিন্দুমানব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিত।

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম বিশ্বশক্তির বিভিন্ন অবস্থানুসারে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। চরমে মুক্তিলাভের

সোপানপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাহারা প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ-সাধনোপযোগী ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিভাগ করিয়াছিল। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই হিন্দুসমাজ ব্রহ্মচারীকে প্রথম হইতে তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব ও মুক্তিবাদের শিক্ষা দিত। তাহার দ্বারা শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস থাকিত। ফলতঃ শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হইলেও, প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইলেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট থাকিত। এইজন্য তাহারা শরীরকে ধর্ম্মের সাধন মাত্র মনে করিত, এবং ধর্ম্মজীবন-গঠনোপযোগী ইহার পুষ্টি ও উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে হিন্দু ব্যক্তিত্ববাদ

এইরূপ স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতাই ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত জীবনগঠনের মূলমন্ত্র। এইজন্য এখানে সাধারণ রাষ্ট্রের জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্র তাহাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিবেচিত হইত না। কেবল লোক-রক্ষার ও দেশরক্ষার উপায় মাত্র ভাবে রাষ্ট্রকে লোকেরা আদর করিত। এই জন্য ভারতবাসীকে প্রধানতঃ রাষ্ট্রে কর্ম্ম করিয়া ও রাষ্ট্রসভায় বক্তৃতা করিয়া কালাতিপাত

রাষ্ট্র সভ্যতার কেন্দ্র নহে

করিতে হয় নাই। 'শ্রমবিভাগে'র নিয়মে রাজহস্তে আভ্যন্তরিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ভার সমর্পিত থাকিত। সাধারণ জনগণ জীবনের চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিতেই বিশেষরূপে যত্নবান্ হইত। রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের ব্যবস্থা করিয়া লইত। কোন এক অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু সভ্যতার চরম শক্তি নিবদ্ধ থাকিত না। এজন্য রাষ্ট্রসভা এবং রাজধানীই তাহাদের সভ্যতার একমাত্র বা প্রধান কেন্দ্র ছিল না। তাহাদের নিজ নিজ আবাসভূমি, লোকালয় ও পল্লীসমূহই হিন্দুসমাজে জীবনী শক্তির প্রধানতম আধার ছিল। এজন্য দেশের সর্ব্বত্র নানাকেন্দ্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে জাতীয় জাবন-প্রবাহের প্রভাব লক্ষিত হইত। ফলতঃ রাষ্ট্র তাহাদের সর্ব্ববিধ জীবনকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই—সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে নাই।

হিন্দু ধন-বিজ্ঞানে মুক্তিতত্ত্ব

এইরূপ জন্মান্তর-তত্ত্বে ও পরকালবাদে বদ্ধমূল ধর্ম্মভাবই হিন্দু জাতির শিল্প-জীবন ও ব্যবসায়-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত

করিত। এই জন্যই বৈষয়িক কাজ কর্ম্মে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্পাদিত হইত। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষের ক্রীড়াপুত্তলীরূপে বিবেচিত হইত না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চরম লক্ষ্যানুসারে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। ইহার ফলেই হিন্দু-সমাজ প্রত্যেক নরনারীর পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিত। এই সকল সুযোগ সৃষ্টির প্রভাবে প্রতিযোগিতা ও জীবনসংগ্রাম সমাজ-জীবন হইতে যথাসম্ভব দূরীভূত হইত।

ব্যবসায়-পদ্ধতিতে সহানুভূতি ও সমবায়-নীতির ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণতা

কৃষিকর্ম্মে, শিল্পে ও বাণিজ্যে হিন্দুসমাজের নিয়ম-গুলি সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিপোষক ছিল। রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াও সমাজপ্রভাবেই হিন্দুর বৈষয়িক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহাদের সমাজ-জীবন এবং পরিবার ও পল্লীর প্রভাব লাভ করিবার ফলে ভারতবর্ষের কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় মানুষকে নির্জ্জীব যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে পারে নাই—বরং অনেক বিষয়ে হিন্দুর মনুষ্যত্ব বিকাশেরই সহায়তা করিয়াছিল। সাংসারিক অভাবগুলির মোচন হইয়া গেলে সহজেই হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক জীবনযাপন

করিবার সুযোগ খুঁজিতে চেষ্টিত হইত—নূতন নূতন পার্থিব অভাব সৃষ্টি করিত না। ভারতের কুটির-শিল্প, কৃষিকর্ম্ম এবং ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের নরনারীর মধ্যে পরস্পর সখ্য সহানুভূতি ও সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকিতে পারে নাই। সমগ্র বৈষয়িক সভ্যতা ত্যাগ-প্রবৃত্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইত।

হিন্দু "শিল্প-শাস্ত্রে" চরমতত্ত্ব

কলাবিদ্যায় অমৃত ও অনাদ্যন্ত ভাবসমূহের প্রকাশ

আমরা দেখিলাম, বৈচিত্র্যপ্রিয়তার ফলে ভারতবাসী ব্যক্তিগত জীবনে ও শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং অ-সর্ব্বাঙ্গীণতার প্রবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কারণ চরম স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই তাহারা শরীর ও বিষয়-সম্পত্তিকে ধর্ম্মজীবনের এবং পরিপূর্ণ মানবত্ববিকাশের সাধনমাত্র মনে করিত। সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মুক্তি এবং চরম লক্ষ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষাই হিন্দু জাতির স্থাপত্যকার্য্যের, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার এবং মূর্ত্তিগঠনেরও প্রাণ। এই আদর্শ ও লক্ষ্যই তাহাদের

শিল্প-নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের উৎপ্রেরণা ছিল। যে কোন উপায়ে যে কোন প্রণালীতে বিশ্বের চরম সত্যগুলি প্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পীর কৃতিত্ব স্বীকৃত হইত। তাহারা স্থূল শরীরের উৎকর্ষেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য স্বীকার করিত না। অন্তরঙ্গের উচ্চ ভাবব্যঞ্জক গড়ন দিতে পারিলেই শিল্পীরা কৃতার্থ মনে করিত। এ জন্যই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট মাংসপেশীর সৌসাদৃশ্যবিশিষ্ট কুস্তিগির-দিগের মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে উৎসাহিত হইত না।

আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনকারী ধ্যানী যোগীদিগের মূর্ত্তি গঠন করিয়া হিন্দুশিল্পিগণ দেবত্ব ও মহাপ্রাণত্বের পরিচয় প্রদান করিত। কিন্তু তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিত যে অসীমকে সসীমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব; রং, মাটি, তুলি, মর্ম্মর, প্রলেপ ইত্যাদি সামান্য সামান্য স্থূল পদার্থসমূহের সাহায্যে বিরাট্ সত্তার চিত্র প্রদান করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এই জন্য ভারতের কারিগরগণ আকৃতির সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল না। ইহজগতে মানবের বিবিধ অসম্পূর্ণতা, বৈসাদৃশ্য ও অসামঞ্জস্য থাকিবেই। কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্যে তাহারা অনাদ্যন্ত পরম সত্যের প্রভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত। এইজন্য তাহারা বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ

কদর্য্যতায় এবং সৌষ্ঠবহীনতায়ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। ভারতের শিল্পিকুল এবং সাধারণ জনগণ অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবুকতার দ্বারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংসারকে যথাসম্ভব মনোরম ও সুখময় করিয়া লইত;—পরস্পর-বিরোধী বাস্তব সমূহের ক্ষুদ্রত্ব ও অসম্পূর্ণতার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইত। প্রকৃত সনাতন বিশ্বসৌন্দর্য্য ও বিশ্বসত্যের মধ্যে তাহারা অস্থায়ী এবং সাময়িক ভাব ও কর্ম্মসমূহের যথানির্দ্দিষ্ট স্থান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। এজন্য অসম্পূর্ণতায়ও সম্পূর্ণতা, অনৈক্যেও ঐক্য, এবং বিচ্ছেদেও মিলন উপলব্ধি করিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না।

হিন্দুসাহিত্যে ভাবুকতা

ভারতবর্ষের সাহিত্যেও এই বিচিত্র সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ চিত্রিত রহিয়াছে। পরিবারগত এবং সমাজ-গত জীবনের আদর্শসমূহ প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্যে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, এরূপ আর কোন সাহিত্যে করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিই যে সভ্যতার কেন্দ্র, এবং ব্যক্তি নিজেই সকল সাধনার লক্ষ্য, অপর কোন লক্ষ্যের সাধনমাত্র নয়—এই আদর্শ ভারতবর্ষের আচার

সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি

ব্যবহার, রীতি নীতি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যো-পলব্ধিই ব্যক্তির চরম লক্ষ্য এবং ইহাই যে তাহার মুক্তি—এই সত্যই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম্মভাবের মূল। হিন্দু-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, মুক্তিবাদ এবং আধ্যাত্মিক-তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর, ব্যক্তি নিজের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য পরি-বারকে, সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে যে অবস্থায় যতটুকু অধিকার দান করিত, সেই টুকুতেই হিন্দুজাতি সন্তুষ্ট ছিল।

রাষ্ট্রের অনায়ত্ত বলিয়া রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়েও ভারতীয় সভ্যতার লোপ-সাধন হয় নাই

এই কারণেই ভারতবর্ষের অসংখ্য রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুর শিক্ষা-পদ্ধতি, চিন্তাপদ্ধতি এবং সাধারণ সভ্যতাপ্রবাহ আজ পর্য্যন্ত নিজের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এবং বহু বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়াও স্বাতন্ত্র্যের সহিত নব নব যুগোপ-যোগী নব নব জীবনীশক্তির প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইতিহাসে শিখজাতি

শিখজাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে এবং শিখ-ইতিহাসের অভ্যন্তর হইতে উপদেশ লাভ করিতে হইলে, প্রথমেই ক্রমবিকশিত সমগ্র ভারতেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় ও স্তর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিতে হইবে। কেননা শিখজাতির সভ্যতা ও উৎকর্ষ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই সহিত ওতপ্রোত-রূপে ও জীবন্তভাবে জড়িত।

ইতিহাস বিজ্ঞান

মানবজাতির ইতিহাসে অসংখ্য মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও সমাজগঠনকার্য্য সাধিত হইয়াছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যে নানা শক্তির কার্য্য হইয়া বিচিত্র ঘটনা-পারম্পর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সমুদয়ের প্রভাবে জগতে বিভিন্ন উত্থান ও অভ্যুদয় এবং পতন ও ধ্বংসের অভিনয় হইয়াছে।

জগতের ঘটনাবলী পরস্পর-সাপেক্ষ

ঐতিহাসিকগণ এই সকল শক্তিপুঞ্জ ও কার্য্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ও 'কার্য্যকারণ'-সম্বন্ধ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোন এক আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্দ্ধারণ, এই সামঞ্জস্যবিধান ও কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয়ের রীতির উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের আলোচনাও এই রীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

আন্দোলনসমূহ সাময়িক ও প্রাদেশিক

ইতিহাস-বিজ্ঞানের শিক্ষা এই যে, জগতের কোন ঘটনা বা কার্য্যই সর্ব্বকালোপযোগী বা সর্ব্বদেশোচিত নহে। বিশেষ কতকগুলি শক্তির প্রভাবে বিশেষ কোন এক বিপ্লবের সূচনা হয়। প্রবর্ত্তক, অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিপ্লবের সহায়তাকারী উপায়সমূহ দেশ ও কালানুসারে স্বতন্ত্র। এই 'দৈশিক' ও 'সাময়িক' ঘটনাবলী পারম্পর্য্য লাভ করিয়া অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের, এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সসীম ও অস্থায়ী মানবের জীবন অনন্ত, অসীম ও চিরস্থায়ী করিতে থাকে। এই ধারাবাহিক বিপ্লবসমূহই সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সনাতন বা সার্ব্বকালিক বা সার্ব্বজনীন বলিয়া কোন তত্ত্ব বা সত্যের প্রতিষ্ঠা রক্ত-মাংসের মানব করে নাই।

তবে জগতে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় না, পরবর্ত্তী কালে তাহার ব্যবহার হয়, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া জনগণ তাহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই উপায়ে সাময়িক এবং প্রাদেশিক সত্যগুলিও একপ্রকার অবিনশ্বর জীবন প্রাপ্ত হইয়া কালে কালে দেশে দেশে কার্য্য করিতে থাকে।

যুগ-প্রবর্ত্তক বাবা নানক

সুতরাং সাময়িক কতকগুলি অভাব পূরণ করিবার জন্যই সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। বাবা নানক

নানকের ধর্ম্মোপদেশ কালোপযোগী

তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমান-মিশ্রিত সমাজের এইরূপই একজন গুরু ছিলেন। বিশেষ এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া উপদেশ-বীজ বপন করিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব, এবং বিশেষ এক ক্ষেত্রে এই বীজসমূহ উপ্ত হইয়াছিল।

পরে সেই ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, নূতন সমাজে নূতন আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়াছিল। কাজেই ধর্ম্ম ও সমাজের

সমাজে বিচিত্র আন্দোলনের ও রূপান্তরগ্রহণের আবশ্যকতা

মধ্যে তিনি যে নবভাবের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই পরবর্ত্তী সমাজের অভাব-পূরণ সম্ভবপর হইল না।

কোন এক সমাজ কেবলমাত্র দু-একটী শক্তির প্রভাবে গঠিত হয় না। বস্তুতঃ জগতে বিভিন্ন শক্তি এবং বিবিধ সমাজসংশ্রব প্রত্যেক সমাজকে সর্ব্বদা বিচিত্র ও জটিল করিয়া তুলিতেছে। এই কারণে কোন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবেই সমাজ চিরকাল চলিতে পারে না।

বিশ্বশক্তির পরিবর্ত্তন

শিখদিগের ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপে এক বিভিন্ন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। নবযুগোপযোগী এক নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। শিখদিগের জাতীয়শক্তি প্রথম যুগে ধর্ম্মপ্রচারে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সমাজ এখন তাহার শক্তি বিভিন্ন এক কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করিল। এই নূতন প্রয়োজন-সাধনোপযোগী আয়োজন হইল বিরাট্ শিখসাম্রাজ্যের সংকল্পে।

শিখদিগের ধর্ম্ম-সমাজের রাষ্ট্ররূপ পরিগ্রহ

কিন্তু হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন, বা হিন্দুমুসলমানের সামঞ্জস্যবিধান অথবা শিখধর্ম্মপ্রচার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচিত্র জীবনপ্রবাহই কি জগতের ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা? যে সময়ে এই দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক

বিশ্বমানবের কার্য্যাবলী ও শিখ-রাষ্ট্র

আন্দোলন চলিতেছে, সেই সময়ে সমগ্র পৃথিবী কি বসিয়া রহিয়াছে? ইতিমধ্যে নানাস্থানে নানা ধর্ম্মের উত্থান, সংস্কার, অভ্যুদয় ও পতন হইল; নানা বিদ্যার বিকাশ, উৎকর্ষ ও বিপ্লব সাধিত হইল। শতাব্দব্যাপী সংগ্রামের পর সংগ্রাম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-মণ্ডলে কত বাধিল। নূতন আবিষ্কার, উপনিবেশ-স্থাপন, রাজ্যবিস্তার, বিজ্ঞানপ্রচার, ও শিল্পপ্রতিষ্ঠার কত বিভিন্ন অধ্যায় মানবেতিহাস প্রকটিত করিল। ভারতবর্ষে ইউরোপ আসিল।

ভারতীয় শান্তিপ্রতিষ্ঠায় শিখের অক্ষমতা

এখন মারাঠা বা শিখ অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। প্রধান আকাঙ্ক্ষা শান্তি, প্রধান অভাব রাষ্ট্রীয় ঐক্য। সুতরাং শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা, অপেক্ষাকৃত প্রবল পরাক্রান্ত, সামঞ্জস্যবিধানক্ষম শক্তি ভারতে নবযুগের নূতনজীবন-প্রবর্ত্তনের সহায় হইল।

ঐতিহাসিকের সমস্যা

এখন কথা এই যে, এই সমুদয় বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্যে শোকাবহ কি?—উত্থান, না পতন? এবং আনন্দের বিষয়ই বা কি? জাতীয়জীবনের সার্থকতা বা পরিসমাপ্তি কোথায়? এবং কোন্ জাতি প্রকৃত সার্থকতালাভ করিয়াছে?

যুগপ্রবর্ত্তকের অমরতা

শিখেরা প্রথমযুগে ভারতবর্ষকে যাহা দান করিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহা দান করে নাই এ কথা সত্য। কিন্তু তাহাদের আদি গুরুর জীবন নিষ্ফল হইয়া গেল—ঐতিহাসিকগণ এরূপ ভাবিতে পারেন না। বুদ্ধদেবের উপদেশের ন্যায় এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া বাবা নানকের দীক্ষা তাঁহার পরবর্ত্তী কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত নানাভাবে নানা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বিচিত্র উপায়ে ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তৎকালাবধি স্বাধীনচিন্তার বিকাশ, পবিত্র-জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি ও মানবসেবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের সাহিত্যে, সমাজে, চিন্তা-প্রণালীতে, পিতাপুত্রের সম্বন্ধে, সাধারণ কার্য্যকলাপে, এবং ধর্ম্মপ্রচারে—কেবলমাত্র পঞ্জাবের জাঠসম্প্রদায়ের ভিতরে নহে, সমগ্র ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া যুগে যুগে বিপ্লবের পর বিপ্লবের অবতারণা করিয়া আসিয়াছে।

জাতীয় জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে ?

এখন কিন্তু শিখদিগের ঠিক সেই আদিম বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি নাই, তাৎকালিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই। সেই

যুগের এবং সেই প্রদেশের সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ও সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া "আদিগ্রন্থে"র শিক্ষা মারাঠী, হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া কত পল্লীর কত নগণ্য লোককে প্রকৃত "শিখ" করিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? শিখসম্প্রদায় হঠাৎ মরুভূমিতে আসিয়া শুকাইয়া যায় নাই। ভারতে বাবা নানকের জীবন সার্থক হইয়াছে, এবং জগতে তাঁহার শিক্ষা অক্ষয় থাকিবে।

আধুনিক ভারত।

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশীয় জনগণের মধ্যে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা প্রধানতঃ বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয়। আমাদের আধুনিক বীরপুরুষগণ রাষ্ট্রনীতির ও ধন-বিজ্ঞানের প্রচারক এবং রাষ্ট্র-মণ্ডলের ও বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মী।

গণ-শক্তির অ-রাষ্ট্রীয় বিকাশ

এক সময়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ সামাজিক আন্দোলনের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। যখন পরাধীনতা স্পর্শ করে নাই, তখন অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিক কর্ম্মের প্রথা প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে সংস্কার করিবার নিমিত্ত এ দেশে জনসাধারণের আন্দোলন চলিত। জাতিভেদ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, ধর্ম্মশিক্ষা, অধিকারিনির্ণয় ইত্যাদি সামাজিক এবং ধর্ম্মজীবনের উন্নতিকল্পেই জনগণের সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা হইত। প্রাচীন হিন্দুজাতি রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মে রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে সম্পূর্ণ অধিকারী করিয়া দিতেন। সমাজের, পরিবারের ও গ্রাম্যজীবনেরই শৃঙ্খলা বিধান ও মঙ্গলকামনায় জনগণ

হিন্দু স্বাধীনতার যুগ

স্বকীয় শক্তির প্রয়োগ করিতেন, তাঁহারা তখন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের তত বেশী ধার ধারিতেন না।

রপধর্ম্ম প্রতিবোধ

তারপব মধ্যযুগে "পরধর্ম্ম" প্রতিরোধ ভারতবর্ষে যে সমস্ত আন্দোলন হইত, তাহা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম ও স্ব'সমাজে'র রক্ষাই প্রধান উপলক্ষ্য থাকিত। ক্ষুদ্র বৃহৎ হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও প্রবৃত্তিই তখনকার ধর্ম্মবিষয়ক এবং রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের মূলে বর্ত্তমান ছিল। রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি জাতির অভ্যুত্থান হিন্দুধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য। মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাব ধ্বংস করাই সেই সময়ে ভারতীয় জনগণের চিন্তা ও কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই সভ্যতাগত ও ধর্ম্মগত বিরোধের উপলক্ষ্য করিয়া এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক পার্থক্য ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া তখনকার ভারত-হিতৈষীরা স্বদেশসেবায় ব্রতী হইতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত সে বিষয় তখন বেশী আলোচিত হইত না। খাজনা দেওয়ার নিয়মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রজাতন্ত্রশাসনের রীতিমত ব্যবস্থা করা উচিত,

মুসলমান প্রভাবের যুগ

তাহাও তখন ভারতীয় জনসাধারণের মনে উদিত হয় নাই। সেই হিন্দুর আধিপত্যকালে রাজতন্ত্র-শাসনের মধ্যেই যেরূপ প্রজাতন্ত্রের বীজ ছিল, প্রজার অধিকার যে পরিমাণে ছিল, তাহার অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য ভারতের বীরপুরুষগণ জনসাধারণকে বিশেষ উত্তেজিত করিতেন না। মুসলমান-প্রভাবকে সমাজ ও দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তখন স্বদেশ-প্রেমের চরম লক্ষ্য ছিল।

তাই তখন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি উভয়ই মিলিত হইয়া যুগান্তর সৃষ্টির সহায়তা করিত। আমাদের দেশের মধ্যযুগের আন্দোলনগুলি ধর্ম্মের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য। দুইই প্রায় সমানভাবে বর্ত্তমান। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার, এবং পারিবারিক জীবনের ও অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টাও হইয়াছিল। প্রতাপসিংহ, গোবিন্দসিংহ, নানক, শিবাজী, রামদাস, কবীর, চৈতন্য, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনের জন্য বিদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, অথবা সমাজে মুসলমানের প্রাধান্যে যে কুসংস্কার ও বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহার বিনাশের জন্য কর্ম্ম করিতেন। একদিকে বিধর্ম্মীর হস্ত

হইতে দেশ ও ধর্ম্ম উদ্ধার করা, অপরদিকে হিন্দুর স্বাভাবিক ভক্তি ও প্রেমের রাজ্য নূতন অবস্থার অনুযায়ি-রূপে বিস্তার করা—এই দুই লক্ষ্য ভারতীয় মধ্যযুগে হিন্দুর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

গণ-শক্তির রাষ্ট্রীয় বিকাশ

ইংরাজ-আগমনের পর নূতন ছাঁচে ঢালা ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এজন্য দেশহিতের চেষ্টা অন্য একরূপ ধারণ করিল। এখন বিদেশের নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান ও শাসনপ্রণালী, জড়-জগতের উপর আধিপত্য-স্থাপন এবং রাষ্ট্রে জাতি-নির্ব্বিশেষে ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক প্রজার অধিকার-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আধুনিক বিশ্বের নূতন নূতন শক্তি ও ভাবপুঞ্জ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই নূতন চিন্তা ও কর্ম্মরাশি কি উপায়ে আমাদের এত দিনকার সভ্যতার অঙ্গীভূত হইতে পারে, এই আদর্শেই ভারতের জনসাধারণ জীবন গঠন করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। কি উপায়ে আমাদের সমাজ আধুনিক ভাবসমষ্টির যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারমধ্যে জীবন্তভাবে নিজস্ব

বর্ত্তমান ভারতে দেশহিতৈষণার লক্ষ্য

প্রণালীতে বিকাশ লাভ করিতে পারে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অব্‌হাওয়ার মধ্যে ভারতীয় নূতন এক সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং ভারতপ্রভাবের দ্বারা বিশ্বের সভ্যতাভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি হইতে পারে—বিগত একশত বৎসরের স্বদেশপ্রেমিকগণ এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

পাশ্চাত্য আমলে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনই ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মের বৈষম্যে, অথবা ভাষার বিভিন্নতায় দ্বন্দ্বকলহ আর বেশী ভীতিজনক বোধ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মের আন্দোলন বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা এখন তত বলবতী নহে। বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় বিকাশের স্বাধীনতা না পাইলে (অর্থাৎ নিজনিজ-শক্তি-অনুসারে পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবার সুযোগ ও অধিকার লাভ না করিলে), দেশের কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম-

বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়েই খর্ব্বতা, হীনতা এবং কুসংস্কার উপস্থিত হয়। অতএব দেশের মধ্যে বর্ত্তমান প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র আবশ্যক—এই আদর্শই আজকাল ভারতীয় স্বদেশ-

প্রেমিকদের চিত্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে এক্ষণে সমাজ-সেবক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মবীরেরই সংখ্যা অধিক।

এখন ধর্ম্মের আন্দোলন এবং সমাজসংস্কারের চেষ্টা যে একেবারে দেখা যায় না, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অন্ততঃ তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের সমসাময়িক চিন্তা ও কর্ম্ম যে দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার প্রধান লক্ষ্য প্রজাশক্তির উত্তোলন এবং দেশে শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চ্চার বিস্তৃতি। এই বৈষয়িক আন্দোলনের ভিতর দিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে এবং সমগ্রজগতে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রসার লাভ করিবে—এই ধারণাই জাতীয় চিত্তে বলবতী হইয়াছে।

নব্যভারতে যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্গবাসী

আধুনিক ভারতের এক লক্ষণ বৈষয়িক জগতে ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে দেশবাসীর অধিকার-স্থাপনের চেষ্টা। আর এক লক্ষণ এই যে, বিশেষভাবে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী-

আধুনিক কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

জাতির কাজ করিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভারত-বর্ষের রঙ্গমঞ্চে রাজপুত, শিখ ও মারাঠার কৃতিত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্র-বল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখন অতীত ইতিহাসের বিস্মৃতিগর্ভে লুকায়িত থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহার বিশেষ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবে মধ্যযুগে একীকরণ ও সমন্বয়-সাধনের সুবিধা পাওয়া যাইত না। এজন্য ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতের মুসলমান-সাম্রাজ্যও লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং হিন্দুদের রাজ্য-প্রাপ্তি ও রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা ক্ষণিক আশাসঞ্চারের মত অলক্ষ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই যুগে জগতের কোথায়ও রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, খবরের কাগজ ইত্যাদির অভাবে ভাব-বিনিময়ের সুবিধা তত বেশী ছিল না। সকল স্থানেই জনসাধারণ রাষ্ট্রশাসনের ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ এবং অনুপযুক্ত থাকিত। সাম্রাজ্যের ঐক্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসম্ভব হইয়াছিল। বিগত একশত বৎসরের ভিতর পাশ্চাত্য-জগতের মনীষিগণ পদার্থবিজ্ঞানের নূতন নূতন কৌশলগুলি

আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার প্রভাবে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, জাতীয়তা, সাম্রাজ্য-তত্ত্ব, প্রজাতন্ত্র-শাসন ইত্যাদি কথঞ্চিৎ কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতেছে। সেই গুলির সাহায্যেই ভারতেও নূতন জীবনপ্রথা, এবং নূতন কৃতিত্বের ইতিহাস রচিত হইতে চলিয়াছে। এই নূতন ইতিহাস রচনায় বাঙ্গালীই অগ্রণী এবং পথপ্রদর্শক। নব্যভারতে বঙ্গবাসী কেন যুগপ্রবর্ত্তক তাহার কারণ বলিতেছি।

নবযুগের কারণ— পাশ্চাত্য সংঘর্ষ

এই নূতন ভাব যে বাঙ্গালায়ই প্রথম উদিত হইয়াছে, এবং এই নবশক্তি যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই প্রথম অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। এইমাত্র বলিলাম, ভারতে নবজীবন সঞ্চারের, এবং নূতন আদর্শস্থাপনের প্রধান কারণ,—ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ইউরোপীয় বিদ্যা, সাহিত্য, সভ্যতা, চিন্তা এবং কর্ম্মই ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে মিলিত হইয়া নূতন এক সভ্যতার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতের যে সমাজে এবং যে প্রদেশে বেশী প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রদেশ ও সেই সমাজই নব্যভারত-গঠনের নেতা, সেই প্রদেশের

চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরই অপরের পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ-স্থানীয়।

বঙ্গে বিদেশীর সম্মোহন

বাঙ্গালা দেশ অনেকদিন হইতে এই পাশ্চাত্যজাতির সংশ্রবে রহিয়াছে। বিদেশীয় শিক্ষা ও চালচলন ভারতের অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা এখানেই অধিক অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজের অতি নিভৃত স্থানে এবং ধর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের আধিপত্য বেশী। দুই ভিন্নপথাবলম্বী সমাজের সংঘর্ষণে প্রথম প্রথম যে যে বিপ্লব ও আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী, সেই সমুদয় বিপ্লব বাঙ্গালী সমাজকে বিশেষরূপেই তরঙ্গায়িত করিয়াছে। বিলাস-প্রিয়তা, সকল বিষয়ে বিদেশীর অনুকরণ, পরকীয় সভ্যতাপরায়ণতা, চাকুরীর প্রবৃত্তি, স্থূল চাকচিক্যে মনোনিবেশ, এবং পাশ্চাত্যজীবন ও চরিত্রের বাহ্য বিষয়গুলির প্রতি আসক্তি ইত্যাদি দোষসমূহ অতি প্রবল ভাবেই বাঙ্গালীর চরিত্র আক্রমণ করিয়াছে।

সকল বিষয়ে 'স্বদেশী'র প্রতিষ্ঠা

আবার এই অবস্থার পুনরায় যে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, বঙ্গদেশেই "স্বদেশী আন্দোলনে"র ভিতর দিয়া প্রথমে তাহারও সূচনা দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালীরা বিদেশীয় সভ্যতার সঙ্গে অত্যধিক

পরিচিত। এজন্য ইহার প্রকৃত জোরের স্থান কোথায়, ইহার অভ্যন্তরে কতখানি সত্য আছে এবং কতটুকু ভারতীয় সমাজের উপযোগী বলিয়া গ্রহণীয়,—সেই সকল বিষয়ে ধারণা বঙ্গসমাজেই বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। সম্প্রতি ভোগবিলাস ও চিত্তসম্মোহনের যুগ বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা যাহা ভারতবাসীর পক্ষে উপাদেয়, সেই সমুদয় নিজের মত করিয়া স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর চরিত্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ভারতবাসীর ধর্ম্ম-গত, সমাজ-গত, পরিবার-গত ও পল্লী-গত জীবনকে নূতন বিশ্বশক্তির উপযোগী করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা বঙ্গেই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমাদের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যরক্ষার চেষ্টা এবং নূতন বিজ্ঞানালোচনার সঙ্গে সনাতন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী।

বঙ্গীয় জাগরণের পরিচয়

আর, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার সুফলগুলি বাঙ্গালাদেশেই বিশেষরূপে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। নব-জীবনের উপলব্ধি, বৈষয়িক উন্নতি এবং স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালায়ই প্রবল।

এই সকল ফলের প্রধান লক্ষণ—নূতন জাতীয় জীবনের অনুকূল বাঙ্গালাভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি। মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয়তা, এক-রাষ্ট্রীয়তা, জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন নূতন প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের মূলমন্ত্রগুলি বঙ্গে গভীরভাবে ও বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এখন সকল প্রকার চিন্তা, সকল প্রকার রচনা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর ভাষায় অত্যুচ্চ দর্শন ও বিজ্ঞানের জটিল ভাবগুলিও সুন্দর ও স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করা যায়। কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সকল বিভাগেই বাঙ্গালাসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি

আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের তুলনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বর্ত্তমানভাষা ও সাহিত্য এখনও অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। নব্য হিন্দীর এখন পর্য্যন্ত ভাষারই স্থিরতা নাই। আধুনিক তামিল ও তেলেগু ভাষায় বর্ত্তমানযুগোপযোগী অতি সামান্যমাত্র মৌলিক সাহিত্য রচিত হইয়াছে। মারাঠী ভাষায় প্রধান প্রধান দুই চারিজন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় মাত্র। উপন্যাস, প্রেম-

সঙ্গীত এবং ধর্ম্মসাহিত্য ব্যতীত অন্য প্রকার চিন্তা আধুনিক যুগে মারাঠী ভাষায় বেশী বহির্গত হয় নাই।

ফলতঃ, সকল দিক্ হইতে বাঙ্গালাদেশেই ইউরোপীয় সভ্যতার কাজ বেশী হইয়াছে। বঙ্গ-সমাজই অধিক পরিমাণে নবশক্তি লাভ করিয়াছে—প্রকৃত নব-জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালীই বর্ত্তমানকালে ভারতের পথপ্রদর্শক, ইউরোপীয় বিদ্যাসমূহ ভারতের উপযোগী করিয়া প্রচলিত করিবার প্রয়াসে নেতা। এই জন্য বাঙ্গালা কর্ম্মীই এখন ভারতে অধিক।

আমরা দেখিলাম,—প্রথমতঃ, আধুনিক ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই প্রধান, এবং দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীই অগ্রণী, বাঙ্গালী বীরেরই প্রাধান্য—বাঙ্গালীই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমগ্র ভারতকে স্বার্থত্যাগী করিয়া তুলিতেছে।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী রহিয়াছে। বীরেরা সকলেই একই অসত্য, একই অবিদ্যা নাশের জন্য আবির্ভূত হন না। সময়ভেদে ও দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মী আবির্ভূত হন। তেমনি কোনও এক সত্যপ্রতিষ্ঠার মধ্যেও আবার স্তর

প্রবর্ত্তকগণের বিভিন্নতা

আছে, প্রণালী আছে। অনেকেই হয়ত এক কাজ করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলেই এক উপায় এবং এক প্রথা অবলম্বন করেন না। কেহ বা চিন্তায় প্রধান, কেহ বা কর্ম্মে প্রধান। কেহ কেহ নূতন আদর্শ, নূতন ভাব ও নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহ বা সুপ্রচলিত আদর্শ ও ভাবগুলিকে নূতন আকার প্রদান করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে গড়িয়া তুলেন।

নব্যভারতোপযোগী চিন্তাবীর

আমাদের এখন এরূপ জন-নায়কের প্রয়োজন, যিনি এই রাষ্ট্রীয় চিন্তারাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের সেনাপতি হইতে পারেন। ভারতবর্ষে বিদেশী-সভ্যতা নানা শক্তির উদ্রেক করিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচিত্র বাসনা উত্থিত হইয়াছে। আধুনিক জগতের উপযুক্ত করিবার জন্য সেই চিন্তাবীর এই সমুদয় বিভিন্ন শক্তি ও বাসনারাশিকে সংযত ও সুসজ্জিত করিয়া ভবিষ্যৎ আদর্শ অনুসারে একই উদ্দেশ্যে সংগঠন করিবেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য ও চিন্তার মধ্যে পরস্পর-বিরোধি ভাব ঘুচাইয়া দিবেন। ফলতঃ, একীকরণের প্রভাবে একটি কেন্দ্রবদ্ধ চিন্তা-

চিন্তা-বিষয়ক ধুরন্ধরের অভাব

রাশির দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকিবে। এইরূপে চিন্তায় দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং ব্যাপকতা আসিবে। আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তার সমন্বয় ও শৃঙ্খলা জন্মিবে। ভাবের অসম্বদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা চলিয়া যাইবে।

এতদিনকার নানা প্রকার আন্দোলনের ফলে যে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আদর্শের ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণতা বিধান এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই লোকের চিত্তে বহু নব আশা ও ইচ্ছা স্থান পাইয়া আসিতেছে। সেই নব আশা এবং ইচ্ছাকে এইরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিলাইতে হইবে। এই শৃঙ্খলীকৃত বিশদ ভাবসমষ্টি নূতন জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ বিকিরণ না করিয়াও বিদ্যমান ভাব ও শক্তিপুঞ্জের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান যায়। পুরাতনকে একটা নূতন আয়তন, আকার ও রূপ প্রদান করাই এই নূতন ধুরন্ধরের প্রতিভার পরিচায়ক হইবে।

নব্য আদর্শের ক্রমবিকাশ

ভারতে ইংরাজ-আগমনের পর অনেক নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া, ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া, বিদেশীয় সমাজের সহিত আলাপ পরিচয় ও সম্মিলনের ফলে, এবং নূতন বিজ্ঞান ও নূতন নীতিশাস্ত্র-পাঠের প্রভাবে আমাদের দেশের লোকেরা এক অভিনব প্রণালীতে সমাজ ও ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এক নূতন চোখে পৃথিবীর হাবভাব, জগতের সমস্ত ব্যাপার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের সম্পর্কে থাকিয়া এবং বিদেশী বণিক্‌দের সঙ্গে ব্যবহারে আসিয়া আমাদের লোকের হৃদয় নূতন অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির উপদেশ বিশেষভাবে লাভ করিয়াছে। এই নূতন আবেষ্টনের প্রভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নানা কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের উদ্যম ও পরিশ্রম চালিত হইয়াছে।

দেশের উন্নতিসম্বন্ধে জাতীয়চিন্তার ক্রমিক বিকাশ

এইরূপে সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, ধনাগম ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই নূতন অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তা এবং স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির ফলে

প্রায় সকল বিষয়েই অশেষ প্রকার তর্ক-প্রশ্ন উঠিয়াছে। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকালমৃত্যু, অত্যাচার, অবিচার, চিত্তসংমোহন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা ইত্যাদি সমাজের অনৈসর্গিক ব্যাধির প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই সকল অবিদ্যা দূর করিবার জন্য দেশে নানাপ্রকার চিন্তাকেন্দ্র ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। নানা অনুষ্ঠান, দলগঠন, সভাসমিতি, ফাণ্ড, কংগ্রেসের অধিবেশন ও বক্তৃতা হইয়াছে। দেশের অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করিবার জন্য আমাদের দেশহিতৈষীরা বিচিত্র আয়োজন করিয়াছেন। সেই সমুদয়ের ফলে প্রকৃত সত্য, প্রকৃত বিদ্যা, প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত শিক্ষানীতি, প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি-স্থাপনের পথে আমাদের সমাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

চিন্তা-ধুরন্ধরের কর্ত্তব্য—জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য-সংগঠন

কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা এতদিন অনেকটা বিক্ষিপ্ত ভাবে হইতেছিল। পরস্পরের সঙ্গে সংযোগে ও আদান-প্রদানে এই সমুদয়ের বিকশিত এবং বর্দ্ধিত হইবার তত সুবিধা ছিল না। সকল প্রকার ভাবনা ও আদর্শ একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দেখা হয় নাই। কেহই এতদিন পর্য্যন্ত এই চিন্তাসমষ্টি ও কর্ম্মরাশিকে ব্যাপক ভাবে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে প্রয়াসী হন নাই। ইহাদের

শ্রেণীবিভাগ এবং একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কেহই বিশেষভাবে অগ্রসর হন নাই।

এই সমস্ত সত্য-আবিষ্কারের পথ পরিষ্কারভাবে সমাজের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে। দেশের যাবতীয় মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-গুলিকে এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড চিন্তা-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। দেশের মহান্ অতীতকে না ভুলিয়া এবং বর্ত্তমান কালের ভাবসমষ্টির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাপুঞ্জ গঠন করিতে হইবে। এজন্য প্রজার রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিভাগ ও কর্ত্তব্য-বিভাগ কোন্ আদর্শে পরিচালিত করা উচিত, সেই আদর্শে ধর্ম্মের কোন্ প্রকার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং কোন্ আন্দোলনের সঙ্গে কোন্ আন্দোলনের পুষ্টি বিধান করা যুক্তিসঙ্গত ইত্যাদি সকল বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ আবশ্যক।

ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং উপকারিতা বিষয়ে জনগণের অস্ফুট এবং উড়ুউড়ু ধারণা রহিয়াছে। এক্ষণে সেই সকলকে এক-কেন্দ্রবদ্ধ আদর্শের প্রভাবে আনিয়া সামঞ্জস্যবিশিষ্ট চিন্তাসঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই চিন্তাসঙ্ঘই বিংশশতাব্দীর যুগধর্ম্ম

হইবে—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের কর্ত্তব্যো-পদেষ্টা থাকিবে।

গত শতাব্দী আমাদের দেশের লোকের হৃদয়ে যে শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, এতদিন আমরা নীরবে বা অস্পষ্ট ভাবে যে আশার কথা ভাবিতে-ছিলাম ও বলিতেছিলাম, সেই আমাদের নূতন আশাবাদী, আদর্শ-প্রচারক চিন্তাবীর এই সকল আধ আধ কথা অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিয়া নীরবতা ও ভীতির অবস্থা দূর করিবেন। লোকের চিত্তে অন্ধকার যেন আর না থাকে। যেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোলমেলে অস্পষ্ট ভাব দূর হইতে পারে।

চিন্তার শৃঙ্খলাবিধান

এখন আমাদের এরূপ চিন্তাবীরের প্রয়োজন—যিনি এত দিনের পর জনসাধারণের মনে উদিত নব্য-ভারতপ্রতি-ষ্ঠার আশাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভাবের সাম্রাজ্য সংগঠিত করিতে পারেন। এই ভাবুকতা, আশাতত্ত্ব, আদর্শ-বাদ ও চিন্তাতন্ত্রই সমাজকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া তাহার বহুদিনের লক্ষ্য এবং অভিলাষকে পূর্ণ করিবে।

বীরত্ব

বিশ্ব-শক্তির সদ্ব্যবহার

নূতন আলোক ও নূতন ভাব বিকিরণ করাই প্রতিভার একমাত্র লক্ষণ নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মী এবং ভাবুকেরা বহু উপকরণ ও উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন।

মৌলিকতার পরিচয়

সেগুলিকে নিজের মত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেও অনেক সময়ে শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যায়। লোক-সমাজে অজ্ঞাত কোন সত্যের আবিষ্কার করা গৌরবজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় বিশেষ পরিচিত, তাহাদিগকেও নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন রূপ প্রদান করা এবং নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করা স্বাধীন চিন্তার এবং মৌলিকতার কম প্রমাণ নয়। পৃথিবীতে যাহা একেবারে জানা ছিল না, এ প্রকার তত্ত্বের ও তথ্যের উদ্ধার অতি অল্প ব্যক্তিই করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই পরিচিত সত্য-নিচয়ের সম্যক্ ব্যবহার এবং প্রয়োগ করিয়াই পণ্ডিতেরা নব নব তত্ত্বের আবিষ্কারকরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

ইউরোপের যত বীরপুরুষদের কথা আমরা জানি,

জগতের যত কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের সন্ধান আমরা পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বগামী ব্যক্তিগণের চিন্তা ও কর্ম্মকেই সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলীকৃত করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রথম এডোয়ার্ড, স্পেনের রাজ-দম্পতী ফার্ডিনাণ্ড এবং ইসাবিলা, ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই প্রভৃতি নরপতিগণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অসামান্য শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁহাদের কার্য্যাবলী পূর্ব্বকালিক মন্ত্রী বা রাজা ও প্রজাগণের আরব্ধ এবং অর্দ্ধসফলতাপ্রাপ্ত কার্য্য ও চিন্তারই ফল মাত্র। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-অসম্বদ্ধ চেষ্টা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের বিশেষত্ব এবং কৃতিত্বের প্রমাণ এই যে, তাঁহারা সেই শক্তি-গুলিকে যথোচিত নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীতে অভিনব চিন্তাকেন্দ্রের ও কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কয়েকটি নরপতির কৃতিত্ব

কবি সেক্সপীয়র সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলনীয় যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাব্য-শিল্পে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি মানবজাতিকে বিমোহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ভগবদ্দত্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিস্বরূপ। তথাপি ইতিহাস-বিজ্ঞান বুঝাইয়া

কবি সেক্সপীয়রের প্রতিভা

দিবে যে, তাঁহার পূর্ব্বগামী কবি এবং সাহিত্যসেবীদের প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সাহিত্য-সম্পদের সেই কীর্ত্তিলাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক গণ্য-মান্য উৎকৃষ্ট লেখকের আবির্ভাব হয়। নাট্যকাব্যের সমস্ত উপকরণই ইনি উত্তরাধিকারীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটক-রচনার প্রণালী, নাটকের চরিত্রসমাবেশ, নাটকের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়া চরিত্র-বিকাশ, ব্যঙ্গরস, ইত্যাদি কোন বিষয়ই তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হয় নাই। নাট্যের মধ্যে ইতিহাস, রাষ্ট্র-নীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরিবার-জীবন এবং সমাজ-চিত্র কোন্ কৌশলে কি উপায়ে প্রকাশ করিতে হয়, নাটকের চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির মুখে কিরূপ কথা শোভা পায়, এবং এজন্য ভাষার কিরূপ বৈচিত্র্য আবশ্যক,—নাটকের এই সমস্ত রীতিনীতি, লিখন-প্রণালী ও অভিনয়-পদ্ধতি তাঁহার সম-সাময়িক সাহিত্য-সমাজে সাধারণ সম্পত্তি রূপে বর্ত্তমান ছিল। এই সকল বিষয়ে তাঁহার মৌলিকতা প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবুও সেক্সপীয়র ইউরোপীয় কবিগণের অগ্রণী। ইহার কারণ, ইনি যে সকল জিনিষ পাইয়া-

ছিলেন, সেই গুলিকে নিজের প্রয়োজন মত স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত এই উপকরণগুলি সাজাইয়াছিলেন, মাল-মসলার অনুপাত এবং উপযোগিতার সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ স্বাভাবিক ধারণা ছিল যে, তাঁহার লেখনী-প্রসূত রচনাগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের আশ্চর্য্য পদার্থ এবং সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ডালহাউসি ও ওয়াসিংটন

ডালহাউসি ভারতে প্রতিষ্ঠিত নূতন রাষ্ট্র-শক্তিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজস্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ব্বসঞ্চারিত শক্তি-সমষ্টির সুব্যবহার করিয়াছিলেন মাত্র। আবার ওয়াসিংটনকে আমেরিকায় যুক্তপ্রদেশ-প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানে পূজা করা হইয়া থাকে বটে। কিন্তু ঐক্য এবং সমন্বয়-সাধনের উপায়-উদ্ভাবন অনেক আমেরিকাবাসীই তাঁহার পূর্ব্বে করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে,—জগৎকে একেবারে নূতন কিছু প্রদান না করিয়াও, কৃতিত্বের সহিত সাজাইতে

গুছাইতে জানিলেই মৌলিকতার এবং অভিনব শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া যায়। যে আবেষ্টন ও শক্তি-সমষ্টির মধ্যে মানুষ সর্ব্বদা চলা ফেরা করিতেছে সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে যথেষ্ট জীবনীশক্তির আবশ্যক হয়। বিশ্ব-শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা অল্প মহত্ত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় নয়।

জগৎকে ব্যবহার করিবার শক্তি

নব-শক্তির আবিষ্কার

নব নব চিন্তার আবিষ্কারক এবং নূতন নূতন কর্ম্ম-প্রণালীর পথ-প্রদর্শক বীরপুরুষগণের সংখ্যাও জগতে কম নহে। তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মিগণের সাহায্য না পাইয়াও বিশ্বে নব নব জগৎ গড়িয়া যান। ভারতের ইংরাজ-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হেষ্টিংস এইরূপ একজন বীরপুরুষ। তাঁহার বহুমুখীন প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চরিত্র নূতন বিচার-প্রণালীর সৃষ্টি-কৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানগণের বিচার-পদ্ধতিতে বহু অসম্পূর্ণতা ছিল, তিনি সেই গুলি সংশোধন করিয়া নূতন এক প্রথার আবিষ্কার

হেষ্টিংসের বীরত্ব

করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যে অতুলনীয়। অথচ তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কোন সাহায্যই পান নাই। তাঁহার কর্ম্ম এত দিনের মধ্যেও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল না।

ম্যাট্‌সিনি ইউরোপে এক নূতন আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। নূতন ধরণের জাতীয়তার সংবাদ তাঁহার দ্বারা প্রথম ঘোষিত হয়। অসংখ্য ভাষা ও ধর্ম্মভেদ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্যেরা এই উপদেশ তাহার নিকট প্রথম শুনিতে পান। অধিকন্তু স্বজাতির উন্নতিসাধনে বিশ্বমানবেরই উন্নতি হয়, এ কথা তিনিই ইউরোপের কাণে প্রথম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি একদিকে যেমন ভাবজগতের পারদর্শী, অপর দিকে কর্ম্মজগতেও বীরপুরুষ। একদিকে তিনি একটি অভিনব রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা ও আবিষ্কার-কর্ত্তা, অপর দিকে মন্ত্রশক্তিবলে আহূত লোকসমাজকে দলবদ্ধ ভাবে রণক্ষেত্রে সম্মিলিত করাইবার অধ্যক্ষ। কর্ম্মজগতে এবং ভাবজগতে অধিকার তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে।

ম্যাট্‌সিনির প্রতিভা

আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিন্তা-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র

নূতন পথের প্রদর্শক। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সংস্রবে আসিয়া আমাদের দেশীয় সমাজ নবভাবে বিকশিত হইতেছে। নব-যুগোপযোগী এক রূপান্তর আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই নব্য-ভারতের গঠনমন্ত্র "বন্দে মাতরম্" মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যখন তাঁহার উপন্যাসে এই মন্ত্র প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তখন তাঁহাকে কেহ বুঝে নাই। আমাদের দেশহিতৈষণা প্রাচীন যুগে বিশেষ এক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। দেশহিতৈষণা এখনকার নূতন অবস্থানুসারে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধান-রূপ নূতন এক আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিতুল্য, দিব্য চক্ষুতে সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি সাধারণ জন-সমাজের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। তিনি নূতন জাতি-গঠনের কাল অদূরে দেখিয়া একটী একীকরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং মাতার আগমনী গাহিয়া-ছিলেন। এত দিন পরে লোকেরা সেই মন্ত্র বুঝিতেছেন।

জাতীয় আদর্শ স্থষ্টি-ব্যাপারে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামমোহনের মৌলিকতা

রাজা রামমোহন রায় বঙ্কিমচন্দ্রের বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। এই জন্য চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি

মহাপুরুষগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া, তিনি হিন্দুসমাজকে বিজাতীয় ধর্ম্ম এবং সভ্যতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমানের উপযোগী এক স্বাভাবিক সংস্কারের প্রণালী দেখাইতেছিলেন।

ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা

বিশ্ব-লীলা

মানবের ইতিহাসে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এক নূতন ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রাণপণ আন্দোলন করিতেছেন, ফলে হয়ত এক অভিনব রাষ্ট্র বা প্রবল পরাক্রান্ত সামরিক জাতির সৃষ্টি হইল। অথবা হয়ত সমাজের রাষ্ট্রীয় বা বৈষয়িক উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশকে উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজা বা প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে এক বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ডবিশিষ্ট অভিনব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া প্রাচীন দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবনকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

কতকগুলি ঐতিহাসিক সমস্যা

অনেক সময়ে কতকগুলি বিষয় লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব বাধে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়। কোনও এক রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইল, অথচ বিশ্বব্যাপী তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া সমগ্র ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিল।

কোনও দুই প্রবল নরপতি হয় ত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, ইতিমধ্যে অন্যান্য সমাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।

আবার বিজ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানানুশীলন, শিক্ষার গণ্ডি-বিস্তার প্রভৃতি মানসিক জগতের কার্য্য লইয়া দার্শনিকেরা ব্যস্ত আছেন,—ফল হইতেছে স্বরাজ, স্বাধীনতা ও প্রজাসাধারণের স্বায়ত্তশাসন। এদিকে রাষ্ট্রনৈতিকেরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচনের প্রণালী-নির্দ্দেশ, রাজা-প্রজার সম্বন্ধনির্ণয়, শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য ও অধিকার-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত, কিন্তু সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সংশয়বাদ ও বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রবেশলাভ করিয়া নবযুগের সূচনা করিতেছে।

সূত্রপাতে যাহা দেখা যায়, শেষে অনেক সময়ে তাহার কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এইরূপে শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিবার আশায় উৎসাহিত হইয়া লোকে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, অথচ অল্প কালের মধ্যেই সমাজশক্তির নূতন সমাবেশ হইয়া রাষ্ট্রের আকৃতি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। আবার অনেক সময়ে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনই উদ্দেশ্য রহিয়াছে; কিন্তু ফল হইয়াছে—ব্যবসায়ে সম্পদ্‌লাভ। একজন ইচ্ছা করিলেন

ধর্ম্মে ঐক্য, ফল হইল শিল্পের সর্ব্বনাশ। কখন বা প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার বর্দ্ধিত এবং রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশহিতৈষিগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এমন সময়ে অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য ঘোষিত হইল। কোনও এক দেশের রাজা ভুল করিলেন, ফল হইল অন্য এক রাষ্ট্রে বিপ্লব এবং রাজতন্ত্রের খর্ব্বতাসাধন। দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু স্বতন্ত্র এক স্বাধীন রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া গেল।

উত্থান-পতনের নিয়ম

মানব-জগতের মধ্যে প্রকৃতির এইরূপ খেয়াল দেখিয়া মানবীয় উন্নতি-অবনতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না স্বভাবতঃই মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন, ধর্ম্মের প্রচার, শিল্পের বিনাশ, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার লোপ, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি মানবের সকল ব্যাপারই যদি অদ্ভুত এবং আকস্মিক ঘটনার ফলে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে কোন্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কোন্ আশায় উৎসাহিত হইয়া মানব জীবন-সংগ্রামে বহির্গত হইবে? উন্নত লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি কি উপায়ে তাহার মর্য্যাদা ও গৌরব স্থায়ী করিবে? কোন্ সহায় অবলম্বন

করিয়া পশ্চাৎপদ ও অবনত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে? কর্ম্মিগণের আন্দোলনসমূহের কোন ফল আছে কি? ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক ও স্বদেশহিতৈষিগণের যত্নের মূল্য কি?

ঐতিহাসিকের আলোচ্য জগৎ

মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আমরা ঐতিহাসিকের নিকট আশা করি। কিন্তু আজকাল

শ্রমবিভাগনীতি

জ্ঞানচর্চ্চা শ্রমবিভাগনীতির অতিশয় অধীন হইয়া পড়িয়াছে। জগতের জটিল সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার জন্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সবিশেষ চেষ্টিত। ইহাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্কীর্ণতা বিধানের ফলে ঐতিহাসিক সমালোচনারও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইতিহাস-বিদ্যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর বিবরণরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস-ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ আজকাল রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, সন্ধি-বিগ্রহ, রাজ্য-বিস্তার, রাজ্যক্ষয়, জয়পরাজয়, এক-রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ ও লোপ ইত্যাদি বিবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারমাত্রের আলোচনা

করেন। তাঁহাদের দায়িত্ব এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে তাঁহারা শক্তি ও সময় প্রয়োগ করেন না। অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরিবার, সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতির প্রভাবে রাষ্ট্রের নিয়ম ও রূপ-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি আলোচনা করেন। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-সমূহের ফলে মানবেব জীবন যে যে বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত হয়, সেই সমুদয়ের আলোচনার জন্য ঐতিহাসিকেরা স্বতন্ত্র সুধীগণের উপর নির্ভর করেন।

বিদ্যাক্ষেত্রে এইরূপ শ্রমবিভাগ-নীতির সুফল আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া অতি সত্বরই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতাবিধানে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। আবার অসুবিধাও মন্দ নয়। বিদ্যাগুলির এরূপ অনৈক্যবশতঃ সমগ্র জ্ঞেয় জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। ইতিহাস-শাস্ত্র প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-গঠনের ভিত্তি ও উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া মানব-জগতের বিশেষ এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে তাহার ফলে সমগ্র মানবের আশা, ভরসা, উন্নতি, অবনতি, লাভালাভ প্রভৃতির নিয়মগুলি আয়ত্ত করিবার দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ শিথিল হইয়াছে।

মানব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় জীব নহে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই মানব-জীবনের লক্ষণ বা পরিচয় এবং সুখ-দুঃখের পরিমাপক নহে। মানবের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পরিচয় গ্রহণ না করিলে মানব সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এজন্য সমগ্র মানব-জীবনের আলোচনা না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। এই অসম্পূর্ণ বিদ্যার সাহায্যে মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশাদি ইঙ্গিত করা অসম্ভব।

ব্যাপকভাবে আলোচনার আবশ্যকতা

জীবনীশক্তির বিকাশ ও জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তির নিয়ম আলোচনা করিবার জন্য স্বতন্ত্র 'প্রাণবিজ্ঞান' (Biology) বা জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রতিপদে ঐতিহাসিককে সেই বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাণবিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মানবজীবনের গতি, মানবসমাজের ক্রম-বিকাশ, মানবচিত্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের ধারণা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইতে পারিবে।

প্রাণবিজ্ঞান ও বিশ্বশক্তি

জগতে জীবনীশক্তির সহায়ক এবং জীবনের পরিপোষক

কতকগুলি শক্তি ও পদার্থ রহিয়াছে। এই বিশ্ব-শক্তির প্রভাবে প্রাণিমণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেক জীবের বিকাশ সাধিত হয়। এই পদার্থগুলি সংগ্রহ ও নিজস্ব করিবার জন্য প্রাণী পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অধীনতা স্বীকার করে। পরিদৃশ্যমান জগৎ জীবের কেবল পরি-পোষকমাত্র নহে। এই বিশ্ব প্রাণিমাত্রের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং বিকাশ ও বংশ-বিস্তারের নিকেতন। সুতরাং জীবের সহিত আবেষ্টনের বা বিশাল শক্তির সম্বন্ধই তাহার জীবনের সকল অবস্থার নিয়ন্তা।

বিশ্বের প্রভাবে প্রাণীর স্বভাব-গঠন

আলোক, তাপ, জল, বায়ু, আহার্য্য প্রভৃতি নানা প্রকার পদার্থ ও শক্তির সমুচ্চয়ে এই আবেষ্টনের সৃষ্টি। তাহাদের মধ্যে সকলগুলিই প্রত্যেক জীবের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় নহে। আবার এই পারিপার্শ্বিকের ভিতরই এমন কতকগুলি শক্তি ও পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা জীবের অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। অধিকন্তু, প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বহুবিধ জীবেরও সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া প্রত্যেক জীব তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এবং জীবনের বিচিত্র অবস্থা

প্রাপ্ত হইতে থাকে। এজন্য প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতি এই সমুদয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর আকৃতিবৈচিত্র্য, বর্ণপরিবর্ত্তন, বিভিন্ন গঠনপ্রণালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী, সন্তানরক্ষা-পদ্ধতি সকল বিষয়ই এইরূপ বিশ্বশক্তির উপর নির্ভর করে। জলজ ও স্থলজ জীবের জন্মনিকেতন ও আবাস-ভূমি বিভিন্ন, ইহাদের জীবনধারণপ্রণালীও বিভিন্ন। এজন্য ইহাদের আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এদিকে স্থলজ প্রাণীগুলিকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিকাশ-লাভ করিতে হয়। এজন্য ইহাদের বিভিন্ন আকৃতি গঠিত হইয়া থাকে।

কোন এক জীবের জীবন-ধারণ ও বংশবিস্তার কেবল-মাত্র তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। তাহার জীবন-যাপনের সকল নিয়মই সমগ্র বিশ্বশক্তি বা আবেষ্টনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সমগ্র জগতের সর্ব্ববিধ শক্তি নানাভাবে কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া নিজের নিজের অঙ্গীভূত করিবার জন্য জীবজগতে বিবিধ প্রয়াস অহরহ

প্রাণীর পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ-বিশ্লেষণ

চলিতেছে। জীবমাত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেষ্টনীর প্রভাবে বিচিত্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল প্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রত্যেক জীবের জীবন ও শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। অন্যান্য জীব তাহাদের নিজের পুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস করিতেছে। জীবসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সখ্যের প্রভাবে জীবজগতের রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রতি-মুহূর্ত্তেই বিশ্বে এই জীবনধারণ লইয়া অনবরত সংগ্রাম চলিতেছে। জীবন-সংগ্রামের ফলে বিচিত্র শক্তির বিকাশ ও বিনাশ সাধিত হইতেছে। সকলগুলির ফল পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটী জীবের জীবনে ও শরীর-পোষণে সহায়তা করিতেছে। কোন জীবই সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কার্য্য সমগ্র বিশ্বের অপরবিধ কার্য্য-কলাপের অধীন। প্রত্যেকের জীবন-মরণ ও স্বাধীনতা অন্যান্য সকলের জীবন-মরণ ও স্বাধীনতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বশক্তি সম্বন্ধে প্রাণি-জগতের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন জীবের জীবনের কোন অবস্থাই সুবোধ্য হইতে পারে না।

মানবজীবনও এইরূপ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মানবের পুষ্টি, বিকাশ ও স্বাধীনতা বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তিপুঞ্জের পরস্পর বৈরিত্ব ও মৈত্রীর উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলেই মানবের বিকাশ, পুষ্টি ও স্বাধীনতা।

বিশ্বশক্তির প্রভাবে মানব চরিত্রের অভিব্যক্তি

মানবের সমাজসৃষ্টি, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠান-গঠন, সকল কার্য্যেই এই আবেষ্টনের প্রভাব লক্ষিত হয়। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের পরিবর্ত্তনগুলি অনুসরণ করিয়া মানবজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদ্ ও ইতর জীবজন্তু বেষ্টনীর প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপান্তর লাভ করে, বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীবনের বিবিধ লক্ষণ প্রকটিত করে এবং আকৃতির পরিবর্ত্তন বিধান করে। মানবও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করে, জীবনধারণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন আকৃতিতে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা

করে: রাষ্ট্র, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ মানবের এই জীবনের অভিব্যক্তি। অবস্থাভেদে এই অভিব্যক্তি-গুলির মৌলিক ও আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া মানব এই সমুদয় অঙ্গের বিভিন্নতা সাধন করে। সুতরাং আবেষ্টন ও জীবন-সংগ্রাম যেমন উদ্ভিদাদি নিকৃষ্ট জীবের গঠন, জীবন, গতিবিধি, বিকাশ, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এই বিশ্বের পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির দ্বারা এবং জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনেই মানবের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়। সুতরাং মানবের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা ধর্ম্মপ্রচার, উপনিবেশ-স্থাপন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠা সকল ব্যাপারই সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববিধশক্তির কার্য্যফলে সাধিত ও নিষ্পন্ন হয়। কোন জাতির জীবন, মরণ, স্বাধীনতা, পুষ্টি ও বিকাশ তাহার স্বকীয় শক্তি, ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাত্রের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর সকল

মানবের পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ

জাতির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তাহা দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের ভার-কেন্দ্র কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সেই বিশ্বব্যাপী ঘটনাচক্রের দ্বারাই প্রত্যেক জাতির উন্নতি, অবনতি, ধ্বংস ও উৎপত্তি, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং কোন এক জাতির কোন এক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সমগ্র মানব-সমাজের, বিশ্বসংসারের সংবাদ লইতে হইবে। পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও চিন্তা-সম্পর্কীয় সর্ব্ববিধ আদান-প্রদানের ফলে বিশ্বশক্তি যেরূপ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, সেই বিরাট্ শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

পৃথিবীর কোন পদার্থ অস্বীকার করিয়া কোন মানবই জীবিত থাকিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক মানবকে অপর সকল মানবের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক মানবকে তাহার শত্রু ও মিত্রের সংখ্যা গণনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। কোন্ কোন্ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি কোন্ কোন্ অবস্থায় মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির অনুকূল, এবং কোন্ কোন্ চিন্তা ও কর্ম্ম-শক্তি তাহার প্রতিকূল এই সমুদয়ের স্থিরীকরণই জীবন-সংগ্রামের প্রাথমিক কার্য্য। ইহার উপরই মানবের জীবনধারণোপযোগী এবং উন্নতিবিধায়ক আয়োজনসমূহ নির্ভর করে।

সুতরাং মানব-সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ সমগ্র মানবেতিহাসের পরিণতির গৌণ লক্ষণ ও পরিচয়। কোন জাতি হয় ত তাহার নিজ জীবন ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে কোন অনুষ্ঠান বা আন্দোলনকে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই অনুষ্ঠান ও আন্দোলন বিরাট্ মানবসমাজের সাধারণ জীবন-প্রবাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। যদি কোন দেশের ভাষার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হয়, অথবা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লাভ ও ক্ষতির দ্বারা সেই সমাজের স্বকীয় ভাগ্য গঠিত হইয়া যাইবে বটে; কিন্তু এই জাতীয় বিকাশ ও বিনাশ অন্যান্য বহুজাতির অভ্যুদয় ও পতনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

জাতীয় উন্নতি ও বিশ্বসভ্যতার সম্বন্ধ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সভ্যতা

প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছিল। এই সমুদয় সভ্যজাতির উৎকর্ষ জগতের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের প্রভাবে এবং অন্যান্য সভ্য ও অসভ্য জাতির উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষের দ্বারা

প্রাচীন মানবের পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ

নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, আহার্য্য-প্রদানের শক্তি, শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ প্রভৃতি বিচিত্র কারণে কোন দেশের স্বাধীনতা, কোন জাতির পতন, কোন সমাজের পরাধীনতা এবং কোন জনপদের অধোগতি সাধিত হইয়াছিল। তাৎকালীন বিশ্বশক্তির বিচিত্র সমাবেশফলে হিন্দু, মিশরীয়, চীনীয়, গ্রীক ইত্যাদি জাতির বিরোধ, সংগ্রাম, সন্ধি, মিশ্রণ, বিবাহ, ধর্ম্মান্তরগ্রহণ, ধর্ম্মত্যাগ, রাজ্যলাভ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই গতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দিগের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের এই জাতিগত সংঘর্ষণ, মিলন ও বিরোধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর পারস্য-সম্রাটের রণ-নীতির প্রভাব ছিল। এমন কি গ্রীকেরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বিবিধ অনার্য্যভাষা-ভাষিগণের গতিবিধিও অনুসরণ করিতে বাধ্য হইত। রোমীয়দিগের ভাগ্য ফিনিসীয়, গ্রীক এবং অন্যান্য অপরিচিত সমাজের ক্রিয়া-কলাপ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বিচিত্রভাবে গঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষও এইরূপে চীন, তিব্বত, গ্রীকরাজা ও বিবিধ অনার্য্যদেশীয় লোকসমাজের ধর্ম্মবিষয়ক, রাষ্ট্রীয়

এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলেকজাণ্ডার কতকগুলি অধীন রাজ্য নূতন গঠন করিয়াছিলেন। সেই সমুদয়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবেষ্টন তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিল্পসম্পর্কীয় উৎকর্ষের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাচীন জাতির জাতীয়তা ও বিশেষত্ব এইরূপে অন্যান্য জাতির জাতীয়তা ও বিশেষত্বের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই স্বাতন্ত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ন্যায় মধ্যযুগেও মানব জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও এইরূপ পরস্পর সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ফল। যে সকল অসভ্য, অনার্য্য বা বর্ব্বর জাতি সভ্যজগতের পার্শ্বে থাকিয়া উন্নত জাতিসমূহের যুগপৎ সাহস ও ভীতির কারণ হইয়াছিল, যাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচীনকালের সভ্যসমাজ এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে নাই, তাহারাই নূতন শক্তির প্রভাবে প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জীবন-সংগ্রামের ফলে একদিকে টিউটন সমাজ অন্ন-সংস্থানের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন আবাস, নূতন

মধ্যযুগের বিশ্বশক্তি

টিউটন জাতি

জনপদ সন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইল। অপর দিকে আরব মরুভূমির এক প্রচারক নূতন দেবতত্ত্ব প্রচার করিলেন, আর অমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ একীভূত হইয়া ধর্ম্মের জন্য দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। নববলে বলীয়ান্ এই দুই সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবৃন্দ আকস্মিক উৎপাতের প্রভাব সহ্য করিতে বাধ্য হইল। ফলে এসিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন জনপদগুলি নূতনভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া নূতন সভ্যতা গঠনের সূত্রপাত করিল।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম

ইউরোপ ও এসিয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রোমীয়সাম্রাজ্যের অধোগতি এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন রাষ্ট্রের গঠন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতালাভ, বিবিধ ধর্ম্মসংগ্রাম, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বাধীনতা ও বিদ্রোহ, মুসলমান রাজ্যের সৃষ্টি, বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ও স্বাধীনতালোপ—সকল ব্যাপার এক বিরাট্ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন কার্য্যকল্পনা মাত্র। নূতন জাতির স্বাধীনতা প্রাচীন জাতির পরাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। পূর্ব্বে যাহারা "বর্ব্বর" নামে অভিহিত হইত,

রোমীয় সাম্রাজ্য

তাহারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্রমে ক্রমে করতলগত করিয়া প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের বিনাশসাধন করিতেছিল। এসিয়াতেও সেইরূপ এক নগণ্য জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ-পূর্ব্বক সমগ্র সভ্যজগতের রাষ্ট্রগুলি পদানত করিয়া নূতন নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিল। মুসলমান-দিগের ভারতীয়প্রদেশ-বিজয়, টিউটন কর্ত্তৃক ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ের অনুরূপ। কোন দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা কেবলমাত্র সেই দেশবাসী লোকের উপর নির্ভর করে নাই। জাতীয় উন্নতি-অবনতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সমগ্র মানব-সমাজের সাধারণ বিকাশের ফল।

এসিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্য

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বশক্তির প্রভাব ও বিভিন্ন জাতির ভাগ্যগঠন

আধুনিক কালে স্বাধীনতা বা প্রজাসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কয়েকটী দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যও এরূপ পারিপার্শ্বিক শক্তি-সমূহের পরস্পর সহায়তা ও আততায়িতার ফলে সংগঠিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত ওলন্দাজ জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ; এবং ইউরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে এক নূতন শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সমগ্র ইউরোপের দান

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে স্পেন-সাম্রাজ্যের অবনতি হইয়া আসিতেছিল। স্পেনীয়দিগের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যভোগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্সের নরপতিগণ স্পেন-সাম্রাজ্যকে খর্ব্বাকৃতি ও খণ্ডীকৃত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে ফরাসী নরপতি সমগ্র ইউরোপের জাতিপুঞ্জেরই শক্তিনাশপূর্ব্বক স্বকীয় আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি স্পেন-সম্রাটের স্বাভাবিক শত্রু হইয়া পড়িলেন। জর্ম্মান্ সম্রাট্ স্পেনীয় সম্রাটের নিকট-আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতের ঐক্য ছিল না। এই ধর্ম্ম লইয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের সঙ্গেও স্পেন-সম্রাটের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল।

এদিকে ফিলিপের ধর্ম্মনীতির নির্য্যাতন-প্রভাবে স্পেন-সাম্রাজ্য হইতে শিল্পনিপুণ ব্যবসায়ীরা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা সহস্রে সহস্রে ইংলণ্ডে আবাস-ভূমি পাইল। ফলতঃ রাষ্ট্রের অর্থশক্তি হীন হইয়া পড়ে। এদিকে ওলন্দাজ-সমাজে প্রকৃত জন-নায়কের অভ্যুদয়

হইতে লাগিল; উৎপীড়িত ওলন্দাজেরা উপযুক্ত বীরপুরুষদিগের নেতৃত্বে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, অধিকন্তু সেই সময়ে ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সমর বাঁধিয়া স্পেনের শক্তি বিভক্ত হইয়া গেল। কাজেই স্পেনের অবনতি, ফ্রান্সের অভ্যুদয়, ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠা, ওলন্দাজদিগের ধর্ম্ম ও দেশ রক্ষা এক বৃন্তে বহু ফলের ন্যায় গ্রথিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাদের কোনটিই অপরগুলির সহিত সম্বন্ধহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠা ইউরোপীয় জীবনপ্রবাহের একটি গৌণ ফলমাত্র

অতএব দেখা গেল—স্পেনের অধোগতি এবং ওলন্দাজদিগের স্বাধীনতা সমগ্র ইউরোপখণ্ডের বিরাট্ জীবন-সংগ্রামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। আবার ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ইউরোপকে তাঁহার যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়ম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের একটি গৌণফল-স্বরূপ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্য-চ্যুতি ঘটে এবং প্রজাসাধারণের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইংলণ্ডের এই গৌরবময় বিপ্লব একমাত্র ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ইংরাজ-জাতির স্বকীয় প্রয়োজন-সাধনের জন্য সাধিত হয় নাই।

সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে এক বিচিত্র যুগ, এক অভিনব ঘটনা-সমাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের নেতা স্বয়ং পোপও তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক ইংলণ্ডের রাজার বিরুদ্ধতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জর্ম্মান্ সম্রাট্ তখন তুরস্কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত, স্পেনের শক্তি অনেকদিনই খর্ব্ব হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই এই সুযোগে সমগ্র ইউরোপ গ্রাস করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ কোন সমাজের তখন অস্তিত্ব ছিল না। এক ক্ষুদ্র সমাজের অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য জীবন গঠন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ ও সেনাবলের অভাব। সুতরাং ইংলণ্ডে যে সমস্ত বৈষয়িক ও সামাজিক সুবিধা আছে, তাহার প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। অথচ ইংলণ্ডের রাজায় প্রজায় ঘোরতর দ্বন্দ্ব বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তাহার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে ফরাসীর অত্যাচার প্রতিহত এবং ইউরোপের স্বাধীনতা

প্রতিষ্ঠিত হইবে না, এ কথা অরেঞ্জ উইলিয়ম বুঝিলেন। কাজেই ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠাই উইলিয়মের জীবন-সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য হইয়াছিল। ইংলণ্ডের স্বাধীন প্রজাশক্তিকে করতলগত করিয়াই উইলিয়ম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন।

ইউরোপীয় ধর্ম্ম-সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয়

ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্ম্ম-আন্দোলনের শেষ অধ্যায় প্রকটিত হয়। কেবলমাত্র মানবকে নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ইউরোপের কোন দেশেই প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্মভাবের দ্বন্দ্ব ঘটে নাই। পোপের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক ক্ষমতার অপব্যবহারে উত্তেজিত হইয়াই ইউরোপীয় নরপতি ও অধিবাসিবৃন্দ সম্মিলন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সুযোগে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী স্বকীয় স্বাধীনতা ও অর্থলাভ এবং বৈষয়িক উন্নতিবিধানের চেষ্টায় আন্দোলন করিতেছিলেন। তাহার ফলে ইউরোপের জাতিগুলি বিভক্ত ও সজ্জিত হইয়া পরস্পর শক্তিপ্রয়োগ করিতেছিল। এই সংগ্রাম ও সন্ধিব্যাপারে ধর্ম্মপ্রচারকেরাই একমাত্র ধুরন্ধর ছিলেন না। ফ্রান্স, জার্ম্মানি এমন কি সুদূর

সুইডেনও ধর্ম্মসংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইয়া নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসংগঠনের ব্যবস্থা করিতেছিল। যখন সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল কেবলমাত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থাই হইয়াছে তাহা নহে; অধিকন্তু স্পেন, ফ্রান্স, প্রুসিয়া, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেরই রাষ্ট্রীয় সীমাগুলিও নূতন প্রণালীতে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক প্রুসিয়া ও রুষিয়ার অভ্যুদয়ের জন্য সমগ্র ইউরোপের দায়িত্ব

সুইডেনের অভ্যুদয় ও ক্রমিক অবনতি, প্রুসিয়ার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি, এবং রুষিয়ার সমৃদ্ধিলাভও এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণের ফলে সাধিত হইয়াছিল। স্পেন ও জর্ম্মান্-বংশীয় নরপতিগণের স্থান অধিকার করিয়া ফরাসীজাতি ইউরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে উন্নত হইতেছিল। সেই সুযোগেই প্রুসিয়া ও রুষিয়ার অভ্যুদয় ঘটিতেছিল। জর্ম্মানেরা তখন ফরাসী ও তুরস্কদিগের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ। সেই সময়ে ইউরোপের সুদূর প্রান্তবাসী শ্লাভনীয় জাতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া, রুষিয়া ও প্রুসিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে নবশক্তিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল। তখন

হইতেই সুইডেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাতন রাজ্যের কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। জর্ম্মান্-সম্রাটের অবনতি, ধর্ম্মসংস্কারের সংগ্রাম এবং নূতন নূতন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় একই আন্দোলনের বিভিন্ন ফল, একই বিশ্বশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি।

তুরস্কের অধীনতা হইতে আধুনিক গ্রীসের উদ্ধারও এইরূপে সমগ্র ইউরোপেরই পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সাধিত হইয়াছে। অল্পদিন হইল জর্ম্মানি ও ইটালীতে যে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও ইংলণ্ড, তুরস্ক, রুষিয়া ও ফ্রান্সের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত-প্রসূত।

ইউরোপের নবীন স্বাধীন জাতি

আধুনিক জর্ম্মানির সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ইটালীর জাতীয় গৌরব, ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রস্থাপন সকলগুলিই পরস্পর-সাপেক্ষ। কোন বিপ্লবই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সাধিত হয় নাই। এটা না বুঝিলে অপরগুলি বুঝিব না—অপরগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে কোন একটিকে বুঝিব না।

হাঙ্গারী দেশও ধীরে ধীরে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে

সমর্থ হইয়াছে। তাহা কেবলমাত্র এই দেশের অধিবাসি-বৃন্দের বীরত্বের প্রভাবে নহে। রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বহুদিন হইতে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলেই জর্ম্মান্ প্রদেশ হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত এবং বিজিত হাঙ্গারি তাহার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

তুরস্ক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এখনও ইউরোপের মানচিত্রে স্বকীয় বিশেষ স্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ রুষিয়ার সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রীয়শক্তির বিরোধ। মধ্য-যুগে দেখিয়াছি রোমান্ ক্যাথলিক জগতের বিধাতা পোপও বৈষয়িক স্বার্থের বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধধর্ম্ম-মতাবলম্বী নরপতিগণকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত রোমান্ ক্যাথলিক সম্রাট্‌কেও পোপ নানা উপায়ে হীন করিবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিককালেও সেইরূপ খৃষ্টান্ রুষিয়াকে খর্ব্ব করিবার জন্য ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টান্‌জাতি মুসলমান তুরস্কের এবং এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন।

এসিয়ার স্বাধীনতা

প্রকৃত কথা এই—কোন ব্যক্তি সমগ্র প্রাকৃতিক ও

মানবীয় জগৎকে অস্বীকার করিয়া একদণ্ডও জীবিত থাকিতে পারে না। সর্ব্বদাই তাহাকে নিজের বেষ্টনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কলেবর ও চিত্ত পুষ্ট করিতে হয়। যতদিন তাহার এই শক্তি থাকে, ততদিন তাহার জীবনের বিকাশ হয়। সেইরূপ কোন জাতিই অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহাদের সহিত নিজের সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া একদণ্ডও মানব-জগতে স্থির থাকিতে পারে না। কোন জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতি কেবলমাত্র সেই দেশীয় বীরপুরুষগণের চেষ্টায়—তাহাদেরই বাহুবলে ও চরিত্রবলে সাধিত হইতে পারে না। সকলকেই সমসাময়িক জগতের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক শক্তিগুলির সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ এবং কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিতে হয়। এই উপায়ে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ববিধ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির বিচিত্র ভাগ্য গঠিত হইয়াছে। সেই বিশ্বশক্তির বিশ্লেষণ করিতে অনেক সময়েই আমরা অপারগ। এই কারণেই অনেক সময়ে বহু ঘটনা আকস্মিক ও অদ্ভুত বোধ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতি-অবনতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব নাই।

জাতীয় স্বাধীনতা ও পরাধীনতা বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তির অধীন

বিশ্বশক্তির প্রভাব এবং রাষ্ট্রের আকৃতি ও প্রকৃতি

রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীও এইরূপে পারিপার্শ্বিক শক্তি-পুঞ্জের দ্বারাই গঠিত হয়। মানবের সকল প্রকার কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সুতরাং রাষ্ট্রকে সমাজের বিবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রকৃতিপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় অধিকার অনেক বেশী। তাহার কারণ এই যে, বিদেশীয় শত্রু হইতে এই দুই দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয় না। সমুদ্রের প্রাকৃতিক শক্তিই ইহাদের প্রধান সহায়। আবার ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার আশা অত্যধিক। কেননা জার্ম্মানি, ইটালী, সুইজর্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ফ্রান্স অতি সংলগ্ন। এজন্য ফরাসী সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই সমীপবর্ত্তী জাতিসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শাসনপ্রণালী অতিশয় কঠোর করিয়াছিলেন। প্রসিয়াও যখন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে-

প্রজার অধিকার

একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-নীতি

ছিল, তখন ইহার চারিদিকেই শত্রু বিরাজমান। এজন্য প্রসিয়ার নরপতিগণকে প্রথম হইতেই অতি সাবধানে রাজকার্য্য সমাধা করিতে হইত। ফলতঃ প্রজার অধিকার খর্ব্বীকৃত ও শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইউরোপের মধ্যযুগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার কারণ আছে। সেই সময়ে রাষ্ট্রেরই ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অনৈক্য নিবারণ এবং ধনী সম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারীদিগের রাজ্যলিপ্সা খর্ব্ব করত নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এইরূপ প্রবল রাজতন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং কি ফ্রান্স, কি ইংলণ্ড, কি স্পেন সকল দেশই (এবং পরবর্ত্তিকালে প্রসিয়া এবং রুষিয়াও) ধর্ম্ম, শিক্ষা, ব্যবসায়, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রজার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক আবেষ্টন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতমহাদেশের বিশাল আয়তন বিভিন্ন সমাজগুলিকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার সুযোগ দিয়াছে। এখানে রাষ্ট্রীয় বিধানের দ্বারা সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইতে

ভারতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ

পারে নাই। এজন্য প্রাচীন পল্লীরাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং গ্রাম্যজীবনের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইয়াছে। এখানে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিঘ্ন ঘটে নাই—বৈচিত্র্য নষ্ট হয় নাই।

আন্তর্দ্দেশিক অবস্থার প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি গঠন

বিদেশীয় রাষ্ট্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সাবধান হইতে হয়। সেইরূপ স্বদেশীয় বিদ্রোহ-দমন এবং অশান্তি নিবারণের জন্যও সকল শাসন-কর্ত্তাকেই প্রস্তুত থাকিতে হয়। স্পার্টার কঠোর শিক্ষা-নীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আন্তর্দ্দেশিক হেলট নামক দাসজাতির শত্রুতা হইতে বিজেতা সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে স্থানে প্রজা অতিশয় দুর্দ্দান্ত অথবা যে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে অতিশয় কঠোর ব্যবস্থাই করিতে হয়। যে জাতির মধ্যে বহুবিধ অনৈক্য, মতভেদ এবং অশান্তির কারণ বর্ত্তমান, যে দেশের অধিবাসিবৃন্দ কখনও একমত হইয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহার শাসনকর্ত্তা যথেচ্ছাচারী না হইলে শান্তিরক্ষা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না।

ফরাসীবিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্রের প্রভাবে নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও অভ্যুদয়। কিন্তু নেপোলিয়ন কার্য্য

আরম্ভ করিলেন। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ফরাসী-সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁহাকে এইরূপ যথেচ্ছাচরণে প্রণোদিত করিয়াছিল। অন্য কোন উপায়ে তখন ফরাসী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। এই জন্যই যখন কোন বিপ্লবের আশঙ্কা করা যায়, তখন রাষ্ট্রনীতিকগণ প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি পাইবার জন্য চেষ্টিত না হইয়া তাহাদিগকে ভীত, ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত ও নির্য্যাতিত করিতে প্রয়াসী হন। তখন প্রতিপদে সামরিক আইন, বিনাবিচারে দণ্ডদান ইত্যাদির ব্যবস্থা না করিলে দুর্দ্দান্ত প্রজা শান্ত হইতে পারে না। আবার এই জন্যই যখন কোন বিপ্লব সাধিত হয়, তখন বিপ্লব-কারীরা অতি কঠোর রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহা না করিলে প্রতিক্ষণেই পুরাতন রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার পক্ষপাতী দল সুযোগ পাইয়া নূতনের বিনাশ সাধন করিতে পারে। ফরাসী-বিপ্লবের যুগে বহুবার ফ্রান্সে রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক বারই পুরাতন দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য বিপ্লবকারীরা নির্য্যাতন-নীতি শ্রেষ্ঠ-নীতিরূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের উপদেশ

এমন কি যাঁহারা ধর্ম্মমত, সমাজসংস্কার অথবা

রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধানবিষয়ে নূতন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিবার ইচ্ছায় শিষ্য ও ভক্ত সমবেত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করিতে হয়। স্বকীয় পুষ্টিসাধনের জন্য শক্তি সংহত ও সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথম অবস্থায় সেবকগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অত্যধিক সুযোগ প্রদান করিলে সম্প্রদায় একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ক্যালভিনের ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং জেসুট ক্যাথলিকগণের মধ্যে এইরূপ কঠোর শিক্ষাপদ্ধতি ও শাসন-নীতি প্রচলিত ছিল।

সমাজবন্ধনে কঠোরতা

বিশ্বশক্তির প্রভাবে ধর্ম্ম ও সমাজের রূপান্তর-পরিগ্রহ

পারিপার্শ্বিক প্রভাবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সীমা এবং রাষ্ট্রীয় আকৃতি ও প্রকৃতি গঠিত হয়, এমন নহে। অন্যান্য জীবের জীবন এবং বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়, মানবজীবনের অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলিও সেইরূপ, রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির

ন্যায়, দেশ কাল ও বেষ্টনীর বিবিধ শক্তিপুঞ্জ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

সপ্তম শতাব্দীতে মহম্মদ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তখন রোমীয় ও পারস্য-সাম্রাজ্য কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিমাত্র রূপে অতিশয় হীনাবস্থায় রহিয়াছিল। এসিয়ার বিভিন্ন জাতি মহম্মদের নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই ধর্ম্মগত ঐক্যে এক নব রাষ্ট্রীয় শক্তি গঠিত হইয়াছিল। জগতে রাষ্ট্রমণ্ডলে এক নূতন প্রভাব দেখা দিল। তাহার ফলে এসিয়া ও ইউরোপের বহু রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হইয়া নূতন মুসলমান-সাম্রাজ্যের সংগঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে এক ধর্ম্মমত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে রাষ্ট্রীয় শক্তি

যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মও এইরূপে প্রথম অবস্থায় উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যেই ধর্ম্মমত রূপে পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রমশঃ এই ধর্ম্মমত বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব লাভ করে। অবশেষে রোমীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সময়ে খৃষ্টান-সম্প্রদায়ই প্রকৃত রাষ্ট্রের স্থান অধিকার

খৃষ্টানধর্ম্ম ও বৈষয়িক সভ্যতা

করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করিল। ফলতঃ যখন অভ্যাগত টিউটন বিজেতৃগণ রাষ্ট্রের কর্ত্তা হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে খৃষ্ট সমাজই সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রকর্ম্মে সাহায্য করিয়া নূতন নূতন শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। শার্লেম্যান এবং অটো দি গ্রেটের ফ্র্যাঙ্কো-জর্ম্মান্ সাম্রাজ্য এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সহায়তাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালে চার্চ্চ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইউরোপের সকল দেশের রাজা এবং সম্রাট্‌গণ ধর্ম্মসমাজের নেতা পোপের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। এই ধর্ম্মসমাজের রাষ্ট্রীয় প্রতাপই মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং সংগ্রামসমূহের মূলীভূত কারণ।

কেবল মাত্র নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অভাব পূরণ করিবার জন্যই কি মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? সমসাময়িক জগতের সামাজিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভাব-মোচনের জন্য সেই সময়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই। এই কারণেই এই দুই ধর্ম্ম-সমাজ সামরিক ও বৈষয়িক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া মানবজগতের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিয়াছিল।

আমাদের দেশেও বাবা নানকের শিখ-সম্প্রদায় ধর্ম্মের অভাব-মোচনের জন্য উত্থিত হয়, ক্রমে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার দমন এবং শান্তি ও সুব্যবস্থা বিধান ইঁহাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই জন্য বৈষয়িক মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পঞ্চনদের মিস্‌ল্ ও খাল্‌সা প্রভৃতি রণসমাজ ধর্ম্মসমাজের স্থান অধিকার করে।

শিখ-সমাজ

আবেষ্টনের প্রভাবে জীবন সর্ব্বত্র একই রূপে অভিব্যক্ত হয় না। কেবল মাত্র রাষ্ট্র ও ধর্ম্মই জীবিত সমাজের লক্ষণ নহে। মানবজীবন কখনও কলাবিদ্যায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও সংগ্রামে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিকাশ লাভ করে। এই বিশ্বশক্তির প্রভাবেই দার্শনিকগণ কালে কালে বিচিত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগধর্ম্মের উপযোগী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রীক্ জগতের দর্শনবাদ জর্ম্মান্ দর্শনবাদের অনুরূপ নহে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক গবেষণা আধুনিক চিন্তার প্রতিকৃতি নহে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইয়াছে বলিয়া মনু, য়্যারিষ্টটল এবং বেকনের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

দার্শনিক মতবাদসমূহের বৈচিত্র্য ও তাহার কারণ

যেখানে কোন অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেইখানেই জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া মানব কখনও রাষ্ট্রীয়, কখনও সামাজিক, কখনও সাহিত্যিক, কখনও ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে জীবনের সার্থকতা লাভ করে। বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের দ্বারা যেমন রাষ্ট্রের বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতি গঠিত হয়, তেমনি বিচিত্র ভাব ও প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানব বিচিত্র আন্দোলন করে। রাষ্ট্রীয় অবসানেও জীবনের অবসাদ হয় না। জীবনীশক্তি ধর্ম্মের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কখনও শিল্পে, কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আন্দোলনে পরিস্ফুট হয়।

মানবীয় আন্দোলন-সমূহের বৈচিত্র্য ও তাহার কারণ

এই জন্য একই আদর্শ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে প্রজাসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন ও অধিকার-বিস্তার,—ব্যবসায় ও বৈষয়িক-ব্যাপারে সাম্যবাদ, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণতা,—ধর্ম্মে জীবমাত্রের আত্মার বিকাশ, সাহিত্যে ভাবুকতা এবং কলাক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়তার আকার ধারণ করে। জীবনীশক্তির বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইবার ফলেই

মানবীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের রূপান্তর গ্রহণ

ফরাসীবিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্ন-জাতির অধিকার ঘোষণা করিয়াছে, সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক ও আবেগময় করিয়া তুলিয়াছে, ধর্ম্মকে মানবের উপকার ও লোকহিতকর ব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং মানবের সাধারণ চিন্তাপ্রণালীকে এক অপূর্ব্ব সাহস ও বিচিত্র শক্তি প্রদান করিয়া বিবিধ বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

ইতিহাসের উপদেশ

সুতরাং 'প্রাণ-বিজ্ঞান'মূলক ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষা এই যে, কোন জাতির কোন ঘটনাই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত নহে। সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, স্বাধীনতালাভ, দেশজয়—সকলই বিভিন্ন জাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলনের সমগ্র বিশ্বশক্তির অধীন। মানব-সংসারের জাতীয় আকৃতি ও প্রকৃতিগুলি পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এই জন্য বিভিন্ন কালে মানব-সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন সঙ্ঘ ও জাতির রূপ গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ, কোন অভিব্যক্তির রূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি

স্থায়ী নহে—সকলেই পরিবর্ত্তনশীল। আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানব যতদিন বিভিন্ন আন্দোলনের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে, ততদিন মানবের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আন্দোলনেও জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে।

বীরপুরুষ

কিন্তু মানবের সঙ্গে অন্যান্য জীবের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। বেষ্টনীর প্রভাবে সকল জীবই গঠিত হয় এবং জীবমাত্রেই আবেষ্টনের শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু একমাত্র মানবই নিজের আবেষ্টন নিজে সৃষ্টি করিয়া লইয়া নিজের ইচ্ছামত বিকাশ-সাধনের আয়োজন করিতে পারে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলিকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য-বিধানের শক্তি একমাত্র মানবেরই আছে। মানব চেষ্টা করিয়া অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পদানত করিয়া নিজের আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারে, দেশ ও কালকে খর্ব্ব করিয়া নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারে;

বশে নূতন অবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য

সমাজকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত করিয়া নূতন ভাব—নূতন ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা অঘটন ঘটাইতে পারে।

মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি অসাধ্য সাধন করিয়াছে। জগতে অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের আল্‌ফ্রেড্‌, ফ্লোরেন্সের লোরেঞ্জো, ফ্রান্সের নরপতিগণ, বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারকেরা, রোমান-ক্যাথলিক জেস্যুট সম্প্রদায়, প্রসিয়ার ফ্রেডরিক, রুষিয়ার পিটার ও ক্যাথেরিণ এইরূপে মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন কালে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া মানবকে নূতন নূতন কর্ত্তব্যের অধিকারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই মানবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে নূতন অবস্থায় আনীত হইয়া নবযুগের অভিনব আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে মানবজাতি নূতন বিশ্বশক্তির মধ্যে নূতন সমস্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন আশায় কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছে।

এই সামর্থ্যের পরিচয়

সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্ জাতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, অথবা পৃথিবীর

কোন্ উদ্দেশ্য কোন্ রাষ্ট্রবিপ্লবে বা ধর্ম্মপ্রচারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা কেবলমাত্র আবেষ্টনের শক্তিসমুচ্চয়ের উপর নির্ভর করে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও শক্তিসমূহই এবং জাতিগুলির পরস্পর-সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া দেয়। কিন্তু এই সংঘর্ষণ ও সংগ্রামের স্বাভাবিক ফলগুলিকে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য ও যোগ্যতাই যুগোপযোগী বিপ্লব-সাধনের ও অবস্থা-সংঘটনের কারণ।

যুগান্তর-স্বষ্টি মানবশক্তির অধীন

কেন একই সময়ে কোন সমাজের উন্নতি, অপর সমাজের অবনতি হয়, একস্থানে শিল্পনাশ, অন্যস্থানে ধর্ম্ম-প্রচার, এক দেশের রাজ্যলাভ, অন্য দেশের সাহিত্য প্রতিষ্ঠা, তাহার জন্য এইরূপ বীরপুরুষোচিত সামর্থ্যই দায়ী। অধিকন্তু কেন বিভিন্ন কালে কোন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আচরণ ও আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাহার জন্য এইরূপ ক্রিয়াশীল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ই দায়ী। পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার করিয়াই মানব ক্রমশঃ বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু ক্রিয়াশীল বীরপুরুষগণের কর্ম্মপ্রভাবেই কোন সময়ে ভারত, মিশর, গ্রীস, কোন সময়ে রোম, কখনও মুসলমান, কখনও

বিচিত্র জাতীয় অবস্থার জন্য মানবের দায়িত্ব

স্পেন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই বীরোচিত সামর্থ্যের প্রভাবেই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুষিয়া ও জর্ম্মাণি বিভিন্ন অবস্থায় ইউরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সময়োপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। আবার এই জন্যই বহুবার জর্ম্মাণি ও ইটালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এজন্যই কখনও নাস্তিকতা, কখনও একেশ্বরবাদ, কোথাও খ্রীষ্টধর্ম্ম, কোথাও ইস্‌লাম, কোথাও সাম্রাজ্যনীতি, কোথাও ব্যবসায়নীতি, কখনও প্রজাতন্ত্র, কখনও রাজতন্ত্র মানব-সংসারের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

মানবের ভবিষ্যৎ

ফলতঃ, কোন্ চিন্তা, কোন্ আদর্শ জগতে কখন প্রভাবান্বিত হইবে, তাহা আকস্মিক বা দৈবঘটনার উপর নির্ভর করে না। মানবের পুরুষকারই এই ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বেষ্টনী ও বিশ্বশক্তি সৃষ্টি করিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই মানব পুরাতনের প্রয়োগ করিয়া নূতনের উদ্ভাবন করিতেছে, এবং পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলি আয়ত্ত করিয়া ইহাদেরই সাহায্যে ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

মানব-সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম-শক্তিগুলি যেরূপ ভাবে

সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া

পৃথিবীকে ব্যবহার করিবার ক্ষমতাই নবযুগের সৃষ্টি করিবে

বর্ত্তমান যুগের কোন্ 'বর্ব্বর জাতি' জগতের ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত করিবার সূচনা করিতেছে এবং এই আন্দোলনের ফলে যে নূতন বিশ্বশক্তির সমাবেশ হইবে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য কোন্ সমাজের কোন্ মহাবীর প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাই এখন মানবজাতির ভাবিবার বিষয়। জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে ব্যক্তি সুযোগসমূহের সদ্ব্যবহার করিয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিয়া নূতন আবেষ্টন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন, সেই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের অগ্রদূত।

যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভাব ও শক্তিসমূহ নিজের প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিয়া নূতন অবস্থা-সংঘটনের সূত্রপাত করিবার উপযুক্ত একজন মাত্র ব্যক্তি থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজ যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র অবস্থায় বিচিত্র তথ্যের আলোচনা ও বিচিত্র আন্দোলনের পুষ্টিসাধন করিয়া বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবজাতির আশা অটুট থাকিবে।

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় সমৃদ্ধির যুগ

নব্য গ্রীক্‌সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ

দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশসমূহ করতলগত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-মন্দির-স্বরূপ বিবিধ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সভ্যতা-বিস্তারের এই সমুদয় কেন্দ্র মানবসমাজকে গ্রীক্‌সভ্যতার দ্বারা রঞ্জিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই জগৎবিস্তৃত গ্রীক্‌-সভ্যতার আধিপত্যকালে চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এই নিবন্ধে তাহার চিত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নূতন নূতন শক্তিসমূহের সংস্পর্শে ও নূতন নূতন ঘটনাবলীর প্রভাবে গ্রীক্‌-সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করে, এবং ইহার কেন্দ্র প্রাচীন গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকন্তু, অল্পকালের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য ম্যাসি-ডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ গ্রাস করিয়া গ্রীক্‌-সভ্যতা-বিস্তারের দায়িত্বগ্রহণ এবং রোমীয় প্রণালীতে গ্রীক্‌-

সভ্যতার রোমীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতে রোমীয় সভ্যতার অবসাদকাল পর্য্যন্ত গ্রীক্-সভ্যতা নিজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ম্যাসিডনীয় ও রোমীয়রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই ম্যাসিডনীয় গ্রীক্সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নীলনদ-তটবর্ত্তী আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগর, রোমীয় গ্রীক্-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নগর-সাম্রাজ্ঞী রোম। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সনগরও ম্যাসিডনীয় এবং রোমীয়ভাব ধারণ করিয়াছিল।

গ্রীক্সভ্যতার নবযুগ

(১) ক্ষুদ্রনগরগত জীবনের পরিবর্ত্তে রাজ-তন্ত্র সভ্যতার প্রবর্ত্তন

নবভাবাপন্ন এথেন্স, নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্জাণ্ড্রিয়া অথবা গ্রীক্ভাবাপন্ন রোম কোন কেন্দ্রই প্রকৃত প্রাচীন গ্রীসের নিদর্শন নহে। সুতরাং গ্রীসের জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসে ইহাদের কোনও স্থান নাই।

এই নবযুগে গ্রীক্দিগের স্বাধীনতা নষ্ট হইল। নবপ্রবর্ত্তিত বিজাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনতায় তাহাদের স্বাভাবিক জাতীয় জীবনের গতি রোধ হইতে লাগিল। পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র সমূহের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন

শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশ-রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, যুক্ত-রাষ্ট্রসমূহ প্রচীন জাতীয় ভাবের বিনাশ সাধন করিয়া অভিনব জাতীয়তা ও নূতন রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্ত্তন করিল।

রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন দেশবাসীদিগের আবাসভূমি হইয়া পড়িতেছিল। নিজ নিজ পল্লী, জনপদ

ক্রমশঃ সমাজে বিশ্বজনীনতার প্রবেশ

বা নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া লোকেরা নূতন নূতন দেশ-ভ্রমণ, পূর্ব্ব নূতন নূতন আচার-ব্যবহার ও নূতন নূতন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া প্রশস্তমনা ও উদারচেতা হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসি-বৃন্দ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইল। সর্ব্বত্র পরস্পর সখ্য, ঐক্য ও সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতেছিল।

বিচারালয়ে ও রাজদরবারে সর্ব্বত্র গ্রীক্‌ভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই উপায়ে বহুদেশে এক ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। শিক্ষা ও বাণিজ্যবিস্তারের ফলে ভাব ও কর্ম্মের আদান-প্রদানের সহায়তাবিধানোপযোগী নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রূপে নানা উপায়ে ব্যক্তিগত জীবনকর্ম্মে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতার পুষ্টি সাধিত হইতেছিল।

এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গ্রীকদিগের চিন্তা-জগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্বরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও জীবন-গঠনের সুযোগসমূহ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্ম রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নৈতিক জগতে ভারকেন্দ্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া জীবনের নূতন আদর্শ, ভাব ও কর্ম্মের নূতন লক্ষ্য, সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(২) পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার বিলোপের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ

কর্ম্মী, উৎসাহী এবং সামরিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বদেশে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া দূর বিদেশে গমন-পূর্ব্বক স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ-সাধনোপযোগী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ রাজবিচারালয়, মন্ত্রণাসভা প্রভৃতি সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নিভৃত স্থানে শিষ্যপরিবৃত হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে বিদ্যালয় ও আলোচনা-সঙ্ঘ প্রভৃতি চিন্তার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা সমাজে স্থির ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনচিন্তা বহুদিন হইতেই

গ্রীক্‌সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। তাহা এক্ষণে নূতন ঘটনাবলীর সুযোগে স্বাভাবিকরূপেই অবারিতভাবে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। জেনো ও এপিকুরাস এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়েরা, রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টিতেই ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ হয়—এই প্রাচীন মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাষ্ট্রাতিরিক্ত ও সমাজবিচ্যুত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ববিকাশের আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গ্রীক্‌জীবন এইরূপে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা, এবং ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া পড়িল। ফলতঃ সাহিত্য, কলা, রীতিনীতি প্রভৃতি সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের রূপান্তর দেখা দিল।

(৩) সঙ্কলন, অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনা-সিদ্ধ বিজ্ঞানের যুগ

সাহিত্যসেবী এবং বিদ্যানুরাগী নরপতিরা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা, ভূসম্পত্তি-দান, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে পণ্ডিতদিগের কার্য্যের সহায় হইতে লাগিলেন। পণ্ডিত-সম্মিলনী, সমালোচনা-সমিতি, সাহিত্য-পরিষৎ, মিউজিয়াম, পুস্তকাগার, বিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতি বিদ্বৎসঙ্ঘ-গঠনের সুবিধা সৃষ্ট হইতে লাগিল। গ্রীক্‌, মিশরীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ-

সমূহের সংঘর্ষণে চিন্তাপ্রণালীর নূতন সংঘটনের সুবিধা ঘটিল। প্রাকৃতিক ও মানবীয় উভয় জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী ও কার্য্যসমূহের বিবরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচিত্র পদার্থ ও দ্রব্যসমূহ বিদ্বৎসমিতিতে আনীত হইয়া আলোচিত হইতে লাগিল।

বিবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের ভাব সুধীমণ্ডলীতে প্রচার হইতে লাগিল। জনসাধরণের বিবিদিষা ও জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হইল। নানাদিকে নানাবিষয় লইয়া চিন্তা,গবেষণা, আলোচনা,তর্ক, বাদানুবাদ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্য চলিতে লাগিল। শিষ্যেরা গুরুদিগের মতবাদ-সমূহের টীকাটিপ্পনী লিখিতে লাগিলেন।

বিচিত্র তথ্যসংগ্রহের ফলে তুলনা ও শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী অবলম্বনের সুযোগ উপস্থিত হইল। উদ্ভিদ্, প্রাণী, ভাষা ইত্যাদি সকল পদার্থেরই নিয়মসমূহ ক্রমান্বয়, পারম্পর্য্য এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের তুলনা এবং তারতম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং চিন্তাপ্রণালীসমূহের স্থান, ক্রম ও পর্য্যায় নির্ণীত হইতে লাগিল। মতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ এবং শৃঙ্খলীকৃত হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল। বাস্তবিক পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক যুগ উপস্থিত হইয়াছিল।

গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই তর্ক এবং যুক্তিমূলক সমালোচনার যুগে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাহিত্যও তুলনা-সিদ্ধ বিজ্ঞান হইয়া পড়িল। লোকে মৌলিক কাব্যাদির রচনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কলন, অনুবাদ ও সমালোচনা প্রভৃতি দ্বারা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে, অগ্রসর হইল। লোকশিক্ষা ও বিদ্যাবিস্তারের জন্য অল্প মূল্যে পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল। লিখন-প্রণালী এবং রচনাকৌশলের অপেক্ষা সরল ও সুবোধ্য ভাষায় ভাব-প্রকাশের প্রতি লোকের দৃষ্টিপাত হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বাগ্মিতা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধান, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গম্ভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলেন।

নব্যশিক্ষাপদ্ধতি

(১) শারীরিক শিক্ষার লোপ
(২) রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার লোপ

সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে শারীরিক এবং মানসিক উভয় শিক্ষারই প্রভাব ছিল। এক্ষণে শারীরিক ও সামরিক উৎকর্ষ ক্রমশঃ

অবনত ও লুপ্তপ্রায় হইল। মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল; সমাজের প্রথম যুগ হইতে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের যে প্রয়াস ছিল, এতদিন তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু রাষ্ট্র-নৈতিক বাগ্মিতা ও সমালোচনা প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ শিথিল হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, জীব, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান গণিত দর্শন প্রভৃতি চিন্তা-জগতের গভীর বিষয়গুলি মানসিক শিক্ষার বিষয় হইল।

(৩) সরকার-পরিচালিত বিশ্ব-বিদ্যালয়

ক্রমশঃ বিদ্যালয়সমূহ সরকারের ব্যয়ে ও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজশক্তির প্রভাবে আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরী পুরাতন এথেন্সকে হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য করিল। অধিকন্তু রোমনগরী সাম্রাজ্য-নীতি দ্বারা বিজিত প্রদেশ-সমূহের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়াছিল এবং গ্রীক্‌সভ্যতার সাহায্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য আপনাকে গ্রীক্‌সভ্যতার রাজধানী ও প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

এই যুগে এথেন্স চিন্তাজগতে সামান্য মাত্র প্রতিপত্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আলেক্‌-

জেণ্ট্রিয়ার নব্য চিন্তাপদ্ধতির অনুকরণের ফল মাত্র—স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশাল সাম্রাজ্যের অন্যতম ষ্টেট-পরিচালিত প্রাদেশিক বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপে সম্রাট্‌দিগের বদান্যতায় নির্ভর করিয়া এথেন্সের শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক্-সভ্যতা প্রথমতঃ স্বকীয় বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ নিজ বাসভূমি হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা সৃষ্টির উপকরণ হইল।

(৪) প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হৃত-প্রভ ও লুপ্তকীর্ত্তি

ইউরোপ ও ভারত

জাতি-গত বৈচিত্র্য

জাতীয় বিশেষত্ব

প্রত্যেক জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মানিয়া লইতেই হইবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এজন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের পক্ষে হানিকরও হইতে পারে। যার যেখানে প্রাণ সেখানটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাজ করা উচিত। স্বাতন্ত্র্য কোথায়,—কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজে লুকাইয়া আছে, এই বিষয় ঠিক না করিতে পারিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। আমড়া গাছে আমের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়—প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিও সমাজের কাছে নিবৃত্তির নিদর্শন আশা করিলে সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। তাই "ইউরোপ এ অবস্থায় এই কাজ করিয়াছিল, আমরাও তাই করি"—এ কথা না ভাবিয়া আমাদের এই এত হাজার বছরের জাতি কি ভাবে

---

* "সাধনা" গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধের কিয়দংশ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চলিয়া আসিয়াছে, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়াছে, এই সব অনুসন্ধান করিয়া "আমরা আমাদের উপযোগী, আমাদের চরম উন্নতির জন্য কি করিতে পারি" এরূপ চিন্তার স্রোত প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ইউরোপ ও ভারত দুই ঠিক এক পথের পথিকও নয়, গন্তব্য স্থানও এক নয়। সুতরাং সকল বিষয়ে অনুকরণ করিলে সুফলের আশা করা বৃথা।

ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র

ইউরোপের মন-প্রাণ প্রধানতঃ বাহ্য বস্তুর দিকে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও আদর্শ স্থূল জগতের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থ ইহার মূলে—সংসারের পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। এজন্য প্রতিযোগিতা, জীবন-সংগ্রামের প্রকোপ এত বেশী এবং শিল্পবাণিজ্য কল-কারখানার এত সমাদর। তাই জড়বিজ্ঞান ইউরোপে এত উন্নত।

আর আজকাল ওখানে টাকা-কড়ির ঝনঝনানি বড় বেশী—পৃথিবীর জিনিষের প্রতি এত আসক্তি বলিয়া দেশীয় আচার-ব্যবহারে চিত্তের যথার্থ উদারতা, হৃদয়ের কোমলভাব ও প্রেম একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাথা খাটাইয়া দেশের কাজে একটা অনুরাগের,

public spiritএর আবির্ভাব করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের গন্ধমাত্র থাকে না। স্বদেশ-হিতৈষিতা তাঁহাদের কাছে সরস মাতৃভক্তি নয়, মনোবিজ্ঞানের সৃষ্ট একটা নীরস ধারণা মাত্র। আর এজন্যই ইউরোপীয় সমাজে প্রকৃত সাম্য নাই। একদিকে যেমন ধনাঢ্য লক্ষপতি, অপরদিকে অসংখ্য ধনহীন পরিশ্রমজীবী। আবার, বিজ্ঞান ইউরোপকে বাহ্য জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ নিজেও বাহ্যজগতের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। তড়িতের শক্তি, বাষ্পের শক্তি সঞ্চালন করিয়া উহারা দেশ-কালকে একেবারে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাদেরই বশে থাকায় পরমাত্মার বিষয়-ভাবনা তাঁহাদের একেবারে লোপ পাইয়াছে। "আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি"র চেষ্টা তাঁহাদের কাছে পাগ্‌লামি বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ ঠিক বিপরীত। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সকল বিষয়েই এখানে এক ভিন্ন ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" এবং আত্মবশতাই যে সুখ এ ভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত। অবশ্য বাহ্যজগতের প্রতি

ভারতবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু বাহিরের জিনিষের প্রতি মন যাহাতে বিশেষ আকৃষ্ট ও আসক্ত না হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বদা এই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জাতীয়তা

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবই এ সভ্যতার মূলে। এখানকার কোন কাজে ইউরোপের প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না—সকল বিষয়ে সহানুভূতি, প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও একান্নবর্ত্তিতাই এদেশের প্রথা। ব্যবসায় বাণিজ্যেও সেই ধর্ম্মের প্রভাব, সহযোগিতা, যৌথকর্ম্ম ও সমবায়। এজন্য অর্থের প্রতি এত অনাদর বলিয়া, বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি কম বলিয়াই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, এবং রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

এই দুই ভিন্ন পথের পথিকের সম্মিলনে এক ঘোরতর বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সেই বিপ্লব আমাদের দেশে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন

এখন চলিতেছে। ইহার ফলে এই হইবে যে, ত্যাগপথাবলম্বী ভারতসমাজ ভোগী ইউরোপের জলে ধৌত হইয়া নূতন উদ্যমে ত্যাগের নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। এই সমাজের বিশেষত্ব যে ধর্ম্মভাব তাহা কখনই লুপ্ত হইবার নহে, তবে এই বিংশ শতাব্দীর নূতন ভাবের সংঘর্ষণে যাহাতে

বিপর্য্যস্ত না হইয়া বরং দৃঢ় এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ভাবে স্বীয় গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, এজন্য ইউরোপের ভারতে আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইউরোপ তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছে।

ভারতে নবশক্তির উন্মেষ

ভারতবর্ষও ইউরোপের ডাকে সাড়া দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর নূতন ভাব ও শক্তি-সমষ্টি ব্যবহার করিবার জন্য ভারতবাসিগণ চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। শিল্পে, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্রতা ও ঐক্যের উপলব্ধি করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্ত্তে অভিনব জাতীয় জীবনের বিকাশ হইতেছে।

বর্ত্তমান ভারতে ইউরোপের দান

আমরা আজকাল ক্রমশঃ এক বিচিত্র ঐক্যের সন্ধান পাইতেছি। ধর্ম্মে, সমাজে, আচার-ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কোন দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা প্রধানতঃ

(১) এক-রাষ্ট্রীয়তা

ও বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য—একরাষ্ট্রীয়তা। আধুনিক কালে আমাদের ভারতবর্ষ অভিনব উপায়ে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের স্বকীয় প্রাচীন সভ্যতার নূতন পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভারতবাসী তাহার স্থান খুঁজিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে।

(২)
জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা যখন ব্যবসায়-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে, তখন তাহাদের এই কার্য্য একটী ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ামাত্র রূপে বিবেচিত হইত। তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজ্য লইয়া যখন ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইল। তাহার ফলে, এক বিচিত্র রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘটন—ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য ও ভারতবাসীর অধীনতা।

এইরূপে পরের বশে থাকিয়াও ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ

দেখিতে পাইতেছি, সুদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক আবিষ্করণ মানব-সমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনামাত্র।

গভীর ভাবে এবং দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত হয় নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব রাষ্ট্রীয়জীবনের গৌরবের সামগ্রী, আমাদের নূতন জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি, সমস্তই আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি।

(৩) কর্ম্ম ও চিন্তার বিবিধ কেন্দ্র

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রথমে যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন,—যখন হইতে আমরা কতকটা স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্ত-শাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ-পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছি, তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় মহাসমিতি, কংগ্রেস, সাহিত্য-পরিষৎ, শিক্ষা-পরিষৎ, বিজ্ঞান-পরিষৎ, বিদেশ-

প্রেরণ-পরিষৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি বিকাশ লাভ করিতেছে।

(৪) ভাবুকতার প্রবর্ত্তন

এমন কি, বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, মানবসেবা, লোকহিতৈষণা, প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতের সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার যে সকল নূতন নূতন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকটা পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রসূত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের নিকট প্রাপ্ত হইয়া গীতা-প্রচারে, দর্শনালোচনায় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগিগণ মুখ্যতঃ গেটে, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন, টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ঋষিগণের শিষ্য। তাঁহাদের চিন্তাগুলি আলোচনা করিতে যাইয়াই আমরা আমাদের ঘরের মহাত্মাদের পরিচয় পাইয়াছি।

ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপীয়েরা নানা

কারণে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীন-চিন্তা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, আত্মার পরিপূর্ণতা, নিম্ন-জাতির অধিকার, ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি সম্যক্‌ অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউ-রোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে একটা ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতি-প্রাকৃত ও অতি-মানবীয় আদর্শ প্রবিষ্ট হইয়া, ইউরোপে এক "অফক্লেরাঙ্গ" বা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইউরোপের এই "রোমাণ্টিক্‌" বা আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের আধুনিক বৈদান্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ। ভারতবর্ষের নবপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীতে এই রোমাণ্টিক্‌ সাহিত্যের প্রভাব ছিল বলিয়া আমরা আমাদের গভীরতর দর্শন সাহিত্য ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। আমাদের সাধুসন্ন্যাসী ও যোগী মহাপুরুষগণকে ভক্তিসহকারে দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট ঋণী—এ কথা স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের কোন গৌরবহানির আশঙ্কা নাই। মানবজাতির সভ্যতা এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদানেই

পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবের সভ্যতা-ভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। আজকাল কতকগুলি নূতন সত্যের উপহার লইয়া আধুনিক ইউরোপ মানবজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতব্য দান করিতে করিতেই অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতন্ত্র উপায়ে এই আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আধুনিক সত্যগুলিকে নিজ বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে।

ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ

আধুনিক গ্রীস, আধুনিক মিশর, প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না, কিন্তু আধুনিক ভারত ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও প্রাচীনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষই যথার্থ ভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও

নব্য ভারতের চিত্র

প্রতীচ্যের সম্মিলন-স্থল। এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে তাহা কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় বা প্রাচীন ভারতেরই পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব শক্তির প্রকাশ—নবযুগোপ-যোগী নবরূপ-পরিগ্রহ।

ভারত-সমাজের প্রথম আবির্ভাব হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যত দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছে—ইহার বাণীকুঞ্জে যত পিকবর সুস্বরে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে—যত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে—যত কাব্য, পুণ্য, মাহাত্ম্য, মহাপ্রাণতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—যত ত্যাগ-বৈরাগ্য-নির্ব্বাণের কাহিনীতে পূর্ব্ব-পুরুষদের চিত্ত উৎফুল্ল করিয়াছে—কঠোর কর্ত্তব্যময় সংসারজীবনের সহিত সন্ন্যাসের যত সমন্বয় হইয়াছে—বিশ্ব-সভ্যতার যত স্রোত আসিয়া ভারতীয় বিশেষ সভ্যতার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে, এই নবযুগে সকলগুলি আধুনিক জগতের কর্ম্ম ও ভাবসমষ্টির সহিত এক অদ্ভুত মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়া—অব্যাহত গতিতে জাতীয় মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে।

(১) বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয়

আমাদের জাতীয় জীবনগঙ্গা হিমাদ্রি সদৃশ অটল

সত্যের শৃঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া এতদিন বিশেষ এক-ভাবে চলিয়া আসিতেছিল এবং বিশেষ এক উপায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল দিয়া আসিতেছিল। সেই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়—ভোগের পথে থাকিয়া কিরূপে ত্যাগের কাজ করা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সেই চেষ্টা। সংসারের সকল কাজকর্ম্ম বজায় রাখিয়া তাহার উপরে কিরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের ছাপ মারা যায়—ইহাই হিন্দুসমাজের সনাতন সাধনা।

এখন এই প্রয়াগ-ক্ষেত্রে নূতন এক স্রোতের সাক্ষাৎ হইল। আমাদের পক্ষে এই স্রোত একেবারে নূতন নহে, কেবল অনেক দিনের অবসাদের পরে আসিয়াছে বলিয়া নূতন বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ প্রভাবটা কিছু প্রবল-ভাবে আমাদের উপর পড়িয়াছে। যাহা হউক, প্রভাবটা এই। পার্থিব জীবনেরও উন্নতি প্রয়োজন—অর্থ একেবারে অনর্থের মূল নহে—জড়বিজ্ঞানেরও আবশ্যকতা আছে—রাজনৈতিক বিষয়েও উন্নতির প্রয়োজন। বাহ্য জগতের প্রতি একেবারে অমনোযোগী হইলে চলিবে না। কেবল নিজের পল্লী বা পরগণার ভাবনা ভাবিলে এখন আর চলে না—স্বদেশ একটী বড় সমষ্টি, তার বিষয়েও সন্ধান লইতে হইবে, লইবার সুবিধাও আছে। ছাপাখানা, ডাকঘর,

রেলগাড়ী, খবরের কাগজ এবং যাতায়াতের সুবিধায় ভাবের আদান-প্রদান এখন সুসাধ্য। এই সকল বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ভাব পাশ্চাত্য জগতেই বিশেষরূপ পুষ্ট হইয়াছে। এ জন্য এইগুলিকে প্রধানতঃ ইউরোপীয় ভাব বলা হইয়া থাকে। ইউরোপীয় এই ভাব আসিয়া আজকাল এখানে মিলিত হইল। আমাদের জাতীয় সভ্যতার শিল্প, রাষ্ট্র, ধন-সম্পত্তি কখনও একেবারে ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই। এজন্য এই গুলিকে আজকাল নিজস্ব করিয়া লওয়া আমাদের কঠিন হইবে না। বরং এখন হইতে দু'য়ে মিলিয়া মিশিয়া নূতন বিজ্ঞানকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সহায় করিয়া দিবে এবং এই সমন্বয়ে সাগরগামিনী স্রোতোবহার মত সমাজে নূতন নূতন উপায়ে চতুর্ব্বর্গ-লাভের সুবিধা সৃষ্টি করিতে করিতে অনন্তের সঙ্গে মিলিতে চলিবে।

(২) ইউরোপের মুক্তি-সাধন

এখন হইতে আমাদের সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়া গিয়া স্বাভাবিক ভাব হইবে। সমাজে প্রথম গঠনের সময়ে অধিকারিভেদানুসারে যে জাতি-ভেদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই অধি-কারিভেদের নিয়মই আজকালকার নূতন অবস্থানুসারে কিছু পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইবে। বর্ণাশ্রমের

ভিত্তি বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর হইবে, এবং ব্রাহ্মণের গৌরব, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, বৈশ্যের কর্ত্তব্য, শূদ্রের অধিকার কিছু নূতন আকারে সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। রেলগাড়ীতে চড়িলে ধর্ম্মের যে হানি আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহারও আর ভয় থাকিবে না। এখন বুঝিতে পারিব যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর উপদেশ আমাদের ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাইতে পারিবে না। বিজ্ঞানকে আমরা যতই নিজের করিয়া লইতে পারিব, ততই বেশ বুঝিব যে, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অত্যুচ্চ বিজ্ঞানের নিয়মেই গঠিত। তার পর, দুর্ভিক্ষ অনাহারের প্রকোপ যখন কমিয়া আসিবে, পরে একদিন এই ভারতের ধর্ম্মনেতারা দেশ হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন এবং একে একে ইউরোপের সকল দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মন-প্রাণ কাড়িয়া লইবেন। ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ইউ-রোপের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়া উহাদের জীবনসংগ্রাম ও সাংসারিকতার হ্রাস করিয়া দিবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন বৈষয়িক ভারে জর্জ্জরিত, এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য বসিয়া আছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতিতেই ইউরোপের মুক্তি।

বর্ত্তমান ভারত

বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার অভাব

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল সমাজেই ভগবানে অবিশ্বাস, পার্থিব উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ, বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, অর্থ পৈশাচিকতা এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার গতি রোধ করিবার জন্য বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই মনুষ্য-সমাজের কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত বিপরীতদিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হঠাৎ চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মবলং পরং বলম্"। সমস্ত পৃথিবীও আজ সেইরূপ ভোগের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে করিতে এক অতি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মানব-সংসার এখন নিবৃত্তি ও ত্যাগের উপাসনায় রত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এখন "ধিগ্ বলং সম্ভোগবলং, ত্যাগবলং পরং বলম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যসমাজ আধ্যাত্মিক নবজীবনে পদার্পণ করিতেছে।

এই বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলন ভারতবর্ষকেই

নিজের কেন্দ্রস্থানরূপে বাছিয়া লইয়াছে। কারণ, ইউ-রোপীয় সভ্যতা যীশু খ্রীষ্টের পরম ধর্ম্মকেও ভোগ-ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। অধিকন্তু ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজ্‌ম্ ইত্যাদি আদর্শবাদ সমূহে মূলতঃ ও যথার্থতঃ ঐক্য, সহানুভূতি, বৈদান্তিক সাম্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্ববাধাহীন পরিপূর্ণতা বিধানের অনুষ্ঠান। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে এইগুলিও অনৈক্য, প্রতিযোগিতা এবং যথেচ্ছাচারের উপায়স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জল-হাওয়ায় সন্ন্যাস ও নিবৃত্তির অনুষ্ঠান জীবিত থাকিতে পারে না।

আধ্যাত্মিক আন্দোলনে ইউরোপ ও ভারত

ভারতীয় প্রবৃত্তি ও সমাজ স্বভাবতঃ এবং চিরকালই ধর্ম্মমূলক। কিন্তু আত্মনির্ভরতার অভাবে সেই ভারতীয় সমাজ শীতসঙ্কুচিত কূর্ম্মের ন্যায় সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মে উদাসীন। এজন্য স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের আন্দোলন এখানে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

স্মৃতরাং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক আন্দোলন ভারতীয় রাষ্ট্র-নৈতিক এবং স্বাধীন শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনের আকার ধারণ করিয়াছে। এখানকার জাতীয় আন্দোলনসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বজগতের মুক্তিসাধন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মানব-জাতির স্বার্থ

ত্যাগই ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত উপকরণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। ত্যাগ-ধর্ম্ম দেশ, কাল ও সমাজের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় ধর্ম্মেরও ক্রম-বিকাশ ও আকৃতি পরিবর্ত্তন হয়। ভারতের বর্ত্তমান যুগে ত্যাগধর্ম্ম দেশসেবারূপ ধারণ করিয়াছে।

দেশসেবাই ভারতবর্ষে নবযুগের নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষালয়, বিজ্ঞানাগার, সমবেত চিন্তা ও কর্ম্মের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলনগৃহ নূতন মন্দিররূপে ভারত-বাসীর চিত্তে ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জাতীয় কর্ম্মের জন্য বিলাসবর্জ্জন ও পরোপকার, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস অবলম্বন নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

———

OPINIONS.

1. MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT **ADITYA-RAM BHATTACHARYYA**, M. A., Fellow, Allahabad University, Late Professor, Muir College, Allahabad, author of *Riju Vyakarana* :—

"I write this in my appreciaton of your effort to facilitate and **popularise the study** of Sanskrit. Your method to teach sanskrit without the learner's going through a first course of grammar merits trial.

The old method has done its part so long and will remain inevitable in the case of higher and thorough study. But if **quicker methods** of acquiring languages, living or dead, be discovered and introduced, humanity will bless him whose inventive genius can succeed to achieve the object which every well-wisher of learning has at heart.

At the very outset the attempt looks somewhat revolutionary. But in other fields it is such **revolutionary departures** from the old track that has hastened the advance of arts and sciences."

2. RAIBAHADAR BABU **SRISH CHANDRA BASU**, B. A., *of the Provincial Civil Service*, (*U.P.*), author of the *Ashtadhyayi* of *Panini*, (M.A. Text-book, London University) and Translator

(and annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads*, *Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the 'Sacred Books of the 'Hindus Series' :—

"The scheme of Sanskrit works in professor Benoy Kumar Sarkar's Pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No Preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up; through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text-book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most **important passages of standard classics**, e. g., *Raghu-vansam, Kumar sambhavam, Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incoporaed in his

book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive ; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the **considerable improvement on the existing Readers and primers** that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara, C. I. E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times ; and it is desirable that the new method should have a **fair trial in our secondary schools** in the interest of educational reform."

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষাব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন, এইরূপ আশা করি। বিনয়বাবু যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য। ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন, এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

৪। শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ এক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তক-লেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণই আশা করা যাইতে পারে যে, তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায় কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজী ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা পাঠ করিতে পারিবেক।

5. Dr. Satish Chandra Banerji, M. A. D. L.,
PREMCHAND ROYCHAND Scholar.

I entirely agree with you in thinking that the methods adopted for the study of languages in this country are defective. Your own plan seems to have been carefully thought out, and it has been admirably worked out. I have no doubt that by following your method our boys will be able to pick up English and Sanskrit much more quickly than they do at present.

6. Babu Sarada Charan Mitra. M. A., B.L.
PREMCHAND ROYCHAND SCHOLAR.

I have gone through the books *Ingraji Siksha* and *Sanskrita Siksha* and *Prachin Greecer Jatiya Siksha* of your 'Siksha Bijnan Series' and am of opinion that they will be of great help to those for whom they are intended. I am glad you are doing a great service in the art of teaching.

৭। গৌড়দূত—শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয়বাবু স্বয়ং এই শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী,

সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট্ গ্রন্থের ভূমিকামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয়বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহেন, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

8. **The Leader,** *Allahabad,* 13*th October, 1911*

Every lover of vernacular literature will welcome the nice little pamphlet, The Man of Letters from the pen of prof. Benoy Kumar Sarkar, Lecturer in the Bengal National Council of Education. It sets forth in a forcible manner a scheme for the fostering of vernacular literature in India.

Prof. Sarkar holds that literature in common with everything else requires **protection** in its infancy. He says that our literature is still in its non-age and it is due to this backwardness and poverty of our language and literature that it has been only accorded a position of second language in the Government's scheme of higher education and has not been entitled to the dignity of the first language.

But this can be achieved if learned bodies like the Bangiya Sahitya Parishad of Calcutta and Nagri Pracharini Sabha of Benares undertake to employ some of the best students of our country to work together for the development of our literature under the guidance and control of such literary men as Dr. Seal of Bengal and Dr. Jha of our provinces. But to secure the services of these students it is essentially necessary that they should be free from all pecuniary wants.

The Bangiya Sahitya Parishad of Bengal took up the suggestion of prof. Sarkar and on the occasion of the fiftieth birthday anniversary of Babu Rabindra Nath Tagore, the greatest living poet of Bengal, have collected a decent fund the proceeds of which will be utilised in the manner indicated above.

The Nagri Pracharini Sabha of Benares can do the same. The Sabha can raise funds on similar occasions and spend them likewise. If this can be done, perhaps it will not be then too much "to expect that in the course of ten years we can have the best literary treasures of the world in our own national literature, that we can have the thoughts and investigations of Plato, Herbert Spencer, Guizot, Hegel and other European philosophers through the

medium of our own language, and that in no time the education of these provinces can grow into one that is natural and really national."

৯। প্রতিভা—ঢাকা

বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর প্রথম গ্রন্থাবলী। ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। মাতৃ-ভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে প্রথম হইতেই বাক্যরচনা ও পদ যোজনা লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। শুদ্ধ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। প্রথমতঃ কেবল শুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া শিক্ষার্থীর কর্ণকে শুদ্ধ বাক্যের ধ্বনিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত পাঠ-সন্নিবেশের পারম্পর্য্য বিজ্ঞানসম্মত এবং আরোহ-প্রণালীর প্রয়োগমূলক। ব্যাকরণ-শিক্ষা ব্যতিরেকে এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী অতি সহজে সংস্কৃত অনুবাদ ও রচনা-পদ্ধতির এবং সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

পাঠগুলি এত সুন্দর ধারাবাহিকরূপে ও ব্যবহারিকভাবে বিন্যস্ত যে ব্যাকরণের অতি জটিল সূত্র-নিয়ন্ত্রিত এবং বিভক্তি-ও-রূপ-বহুল সংস্কৃত ভাষা অতি সরলভাবে (এবং রূপ-ও-বিভক্তিহীন ভাষার ন্যায়) অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে। ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক।

সংস্কৃতশিক্ষার সৌকর্য্যসাধনে অধ্যাপক সরকারের পুস্তিকাবলী

তজ্জাতীয় আধুনিক গ্রন্থনিচয় অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর কত উপযোগী তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারিবেন। যুগধর্ম্মের ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং শিক্ষাদানের প্রাচীন প্রণালী বর্ত্তমানকালে আর প্রযোজ্য নহে। পণ্ডিতবর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষাকার্য্য সাধন করিবেন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে কি না তাহার বিচার হওয়া উচিত।

ইংরাজী শিক্ষা :—এরূপ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় বিরল না হইলেও মাতৃভাষার সাহায্যে লিখিত ঈদৃশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন। সংস্কৃত শিক্ষাদান-প্রণালীর ন্যায় এগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্ত্তক এবং ধারণা ও স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার-নিবারক।

মৌখিক শিক্ষা হইতে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে আপন আপন বেষ্টনী মধ্যে প্রয়োক্তব্য ইংরেজী শব্দ লইয়া ইংরেজী বাক্যে সেই সেই শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে বিনা আয়াসে বিভিন্ন জাতীয় সাধারণ পদার্থের সহিত পরিচিত হইয়া শিক্ষার্থী সরলবাক্য রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবে। মৌখিক শিক্ষাকালেই প্রশ্নোত্তর এবং আদেশ সম্বন্ধীয় বাক্যে শিক্ষার্থী অভ্যস্ত হইবে।

পাঠবিন্যাসগুলি ধারাবাহিক ও ক্রমিক। এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে স্বল্পায়াসে সুফল লাভ হইবে। প্রথমভাগের দ্বিতীয়

অনুশীলনে উচ্চারণ-বিষয়ক পাঠগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে আসিবে। দ্রষ্টব্যাংশগুলি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং শিক্ষকের পক্ষে মূল্যবান্।

10. *Empire—23rd September*, 1911.

All students of Sanskrit language and literature should note the improvements made by Professor Sarkar, and educational authorities may see their way to give a **fair trial to his method** of teaching in the schools under their jurisdiction.

The author's "Prachin Greecer Jatiya Siksha' is in some respects a unique production in Bengali. It contains an excellent introduction to the science of education. Then follows an account of the systems of education which obtained in Sparta and Athens. In the concluding chapter ancient Greece and India have been compared from several points of view.

Professor Sarkar's volume is an **important contribution to Bengali literature** and should be bought in hundreds. We understand that all profits arising out of the sale of this book will go to the funds of the Bangiya Sahitya Parishad, the leading literary society of Calcutta.

১১। হিতবাদী—১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭ সাল

এ পুস্তকের আলোচনাপদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

12. *The Bengalee, September,* 1910.

A MONUMENTAL WORK,

"*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta** is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *histoarial*, *theoretical* and *practical.*

* * * * *

It is highly desirable that the **new method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges.

Government is also alive to the cause of primary education. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community.

Slur is often at our graduates that they are not fit for any original work, we invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the **cause of educational reform**.

১৩। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষাকর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেশ-হিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজ-হিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক জ্ঞানমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসী-দের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই সমীপবর্ত্তী

ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন। এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।”

১৪। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭

গ্রন্থকার “শিক্ষাবিজ্ঞান” নামক বিশখণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট্ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্টস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধীমণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত “বিজ্ঞানের” প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৫। ভারতী—কার্ত্তিক ১৩১৭

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থকারের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত, আমরাও তদ্রূপ

আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা, সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকাপাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজিকালকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক, শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

16. The Modern Review—October, 1910.
The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education Series' which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of **Educational Reform** in our country, and we recommend this introduction to our teachers for perusal.

১৭। আর্য্যাবর্ত্ত—কার্ত্তিক ১৩১৭

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাষ বা অবতরণিকা। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায় শিক্ষা-বিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিদর্শনে, কোমত্ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণী-বিভাগে যে একটী ভাবসমগ্রতা প্রদর্শন

করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন; জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকায় ভূমিকালেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই।

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষায় সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না শিক্ষা-বিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * * *

বিষয়ের গুরুত্বতুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমাণ বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা

যায়। গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

18. THE HINDUSTHAN REVIEW—
Allahabad.

Professor Benoy Kumar Sarkar's *Economics* in his *Aids to General Culture Series* an exposition of the science as conceived in Europe from Adam Smith to Marshall, but the last chapter *The Meaning of Indian Economics—Different standpoints*" is bound to prove not only interesting but instructive to students in the country. In this the author gives a lucid summary of the different standpoints from which the subject may be studied.

He distinguishes between what passes for Indian Economics in the curriculum as a study of present day facts and phenomena relating to the industrial commercial organisation of the society and the position the subject should have as a contribution to the universal science of Economics, which is yet in the making according to the principles of the inductive-philosophical method. According to this view Indian Economics *as an applied science* should mean not an Economic History as set forth by Mr. Romesh Dutta or a summary of what is available in the Economic and Administrative sections of the *Imperial Gazetteer of India*, but a study of the methods and means of the socio-economic and economico-political advancement of India.